The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

বাংলা উপন্যাসে বেদে সম্প্রদায়ের যৌনজীবন (১৯৪৯-২০১৪)

[The Sexual Life of the Bede Community in Bengali Novels (1949-2014)]

Muhammad Alamgir, PhD
Professor, Department of Theatre, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 12 February 2025
Received in revised: 27 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Marriage, marriage customs, marriage and divorce, love and social mobility, adultery, sexuality, romantic conflicts.

ABSTRACT

The Bede community is one of the prominent river-dependent human groups in Bengal, and their cultural distinctiveness is noteworthy. Bengali novels provide considerable insights into the sexual life of the Bede community. Their sexual life is quite different not only from that of the Bengalis living on the plain lands of Bengal but also from that of the other indigenous or minority ethnic groups residing in the region. Exploring the variations in human sexual behavior is crucial for understanding reproductive anthropology, and the diverse sexual life of the Bede community—who remain largely isolated from the Bengali mainstream population—can be considered essential for reconstructing the social, cultural, and psychological history of the Bengali marginalized communities. This article presents an analysis of the dynamics and characteristics of the sexual life of the Bede community as reflected in Bengali novels.

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশ নিয়ে গঠিত বাংলা অঞ্চলের বিস্তৃতি প্রায় আড়াই লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এই অঞ্চলের মানুষের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ নদী এবং বাংলার নদীনির্ভর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেদে সম্প্রদায় অন্যতম। বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত বেদে সম্প্রদায়ের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাদের যৌনজীবন বিধৃত হয়েছে। যতদূর জানা যায় অমরেন্দ্র ঘোষের (১৯০৭-১৯৬২) 'পদ্মদীঘির বেদেনী' (১৯৪৯) বেদেজীবনকেন্দ্রিক প্রথম উপন্যাস এবং এই জাতীয় সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস প্রফুল্ল রায়ের (১৯৩৪-২০২৫) 'বেদের নৌকোয়' (২০১৪)। সংগত কারণে অমরেন্দ্র ঘোষের 'পদ্মদীঘির বেদেনী' থেকে প্রফুল্ল রায়ের 'বেদের নৌকোয়' পর্যন্ত এই প্রবন্ধের পরিধি নির্ধারিত হয়েছে। অমরেন্দ্র ঘোষের 'পদ্মদীঘির বেদেনী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫১), ইব্রাহিম খলীলের (?-?) 'বেদেনী জোলায়খা' (১৯৬০), শামসুদ্দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) 'কাঞ্চনমালা' (১৯৬১), রাবেয়া খাতুনের (১৯৩৫-২০২১) 'মধুমতী' (১৯৬৩), প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' দ্বিতীয় পর্ব, (১৯৭০), সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) 'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে' (১৯৭১), অভিজিৎ সেনের (১৯৪৫-) রহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫), আশরাফ সিদ্দিকীর (১৯২৭-২০২০) 'গুণীন' (১৯৮৯), প্রফুল্ল রায়ের 'বেদের নৌকোয়' ইত্যাদি উপন্যাসে বেদে সম্প্রদায়ের যৌনজীবন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। বাংলা উপন্যাসের উক্ত প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধিৎসু মনে বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন- বেদে সম্প্রদায় কত বছর বয়সে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেয়? তাদের মধ্যে বিধবা বিয়ে এবং তালাক প্রথা প্রচলিত কিনা? স্ব-সম্প্রদায়ের নারী পুরুষের প্রণয়কে তারা কীভাবে দেখে? অন্য জাতির সঙ্গে বেদেসমাজের ছেলে-মেয়ের প্রণয়ের ক্ষেত্রে বেদেসমাজের প্রতিক্রিয়া কী? যৌনতা সম্পর্কে তাদের বিবেচনাবোধ কিরূপ? ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক বিচার পদ্ধতি ও তার ফলাফল কী? ইত্যাদি। বাংলা উপন্যাসের গবেষণার ক্ষেত্রে উক্ত বিষয় সম্পর্কে সার্বিক কোনো পর্যালোচনা পরিলক্ষিত হয় না। সংগত কারণে বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে এবং বাংলা উপন্যাসে যেহেতু বাংলার সমাজমানসের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী–সেহেতু বাংলা উপন্যাসের নিবিড় পঠন-পাঠন ও যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত জিজ্ঞাসাসমূহের জবাব আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২. বাংলায় বেদে সম্প্রদায়

বাংলার নদীনির্ভর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেদে সম্প্রদায় অন্যতম। এক সমীক্ষা অনুযায়ী কেবল বাংলাদেশে ১৬ হাজার ৬ শত ৪১ জন বেদে রয়েছে।[১] অনুকূল পরিবেশের কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে সাপের উপস্থিতি পৃথিবীর অন্য যে কোনো অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি।[২] অন্য জীব থেকে সাপের শারীরিক স্বাতন্ত্র্য ও জীবন যাপন পদ্ধতির ভিন্নতা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ পর্যবেক্ষণ করেছে। বিশেষ করে সাপের উপস্থিতি অনুধাবনে মানুষের ব্যর্থতা, পদহীন সাপের দ্রুতগতি, জীর্ণ খোলসের পরিবর্তন, দীর্ঘদিন শীত নিদ্রায় থেকেও বেঁচে থাকা ইত্যাদি বিষয় মানুষের মনে ভীতির সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল

ও ভক্তির সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষের পুরাণ-লোককথা-সাহিত্য-চিত্রকলা-ভাস্কর্য অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতিতে সাপের উল্লেখযোগ্য অবস্থান লক্ষণীয়।[৩] সংগত কারণে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সাপের দংশন এড়াতে এবং সাপের দংশনজনিত বিষক্রিয়ার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে মানুষ জানতে চেষ্টা করেছে। ভারতীয় পুরাণে এ বিষয়ে কিছু কিছু কথা জানা যায়। 'ঋগ্বেদে' প্রথম সাপের মন্ত্রের দেখা পাওয়া যায়।[৪] পরবর্তীকালে 'অথর্ববেদে' সাপের দংশন ও প্রতিকার সম্পর্কে অধিকতর মন্ত্র লক্ষণীয়।[৫] 'মহাভারতের' ভাষ্য অনুযায়ী সর্পরাজ বাসুকী তাঁর ফণার উপর পৃথিবী ধারণ করে আছেন এবং এই মহাকাব্যে সাপ সম্পর্কে প্রচুর কথা জানা যায়।[৬] কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' বলা হয়েছে রাজা অবশ্যই অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মূষিক, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র পশু, রাক্ষস ইত্যাদির অত্যাচারের মতই সাপের অত্যাচার থেকেও প্রজাদের রক্ষা করবেন।[৭] 'অর্থশাস্ত্রে' সাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার কথাও বলা হয়েছে।[৮] বন্দ্যঘটীয় আর্তিহর পুত্র সর্বানন্দ দ্বাদশ শতকে বেদে বা বাদিয়া নামের অন্ত্যজ শ্রেণির কথা বলেছেন যারা বাংলাদেশে সাপ খেলা দেখাতো।[৯] আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪) বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশের সমাজজীবনে সাপুড়ে তথা বেদেসমাজের উপস্থিতির বিস্তর প্রমাণ তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন।[১০]

বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়ের আদি বাসস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে। একটি মতে বেদেদের আদি বাসস্থান আরাকান।[১১] অন্য একটি মতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা জিপসি তথা যাযাবররা (যাদের একটি অংশ বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়) মূলত ভারতের অধিবাসী।[১২] অনেকের মতে বেদের উৎপত্তি স্থল ভারত[১৩]–বিশেষকরে উত্তরভারত।[১৪] ব্রিটিশ রিপোর্ট অনুযায়ী বেদের আদি বাসস্থান ভারতের গুজরাট।[১৫] জাহানারা হক চৌধুরীর (?-?) মতে বেদুইন সম্প্রদায় সমুদ্র পথে বোম্বাই বন্দরের ভেতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।[১৬] কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' অনুযায়ী গুপ্তচর বৃত্তির জন্য বেদেদের সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৭] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতিমান পুরাতত্ত্ববিদ ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের (১৮৯০-১৯৭৭) বরাত দিয়ে বেদে সৃষ্টির মূলে গুপ্তচর প্রথা প্রবর্তনকে দায়ী করেন।[১৮] জেমস টেলরের (?-?) মতে নিম্ন ও অশুদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক হচ্ছে বেদে। প্রকৃতপক্ষে তারা হিন্দু, কি মুসলমান তা নির্ণয় করা কঠিন। কেননা বাহ্যত তাদের ধর্মীয় মত, দেশের যে যে অঞ্চলে তারা বসত করছে, সেই সেই এলাকায় প্রচলিত ধর্মমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বেদে সমাজের বাইরে আলাদা করে সাপুড়ে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় কসরত দেখানোর জন্য বাজিকররা সরকারকে কর দেয় যার নাম 'চান্দিনা দামদারী।'[১৯] অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের লুবিনির জবানিতে জানা যায়–বেদে বাজিকরের নিজের দেশ, ভাষা বা ধর্ম নেই। বাজিকররা–'যেথায় ঘুরে সিথাকার বুলি ধর‍্যে লয়, সেথাকার ধরম করম শিখ্যে লয়। সিটা তার আপন বুলিতে মিশাল কর‍্যে লয়। বাাজিকরের আপন আপন কুনো ধরম নাই।'[২০] জেমস ওয়াইজ (১৮৩৫-১৮৮৬) এর মতে বেদে হচ্ছে ধর্মচ্যুত হিন্দু। আবার তিনিই বেদেদের মধ্যে বিদেশি অর্থাৎ ইউরোপীয় জিপসিদের কিছুটা আদল লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে বাদিয়া শব্দটি সংস্কৃত ব্যাধ থেকে ব্যুৎপন্ন–যার অর্থ–শিকারি। তিনি উল্লেখ করেছেন ফরায়েজি আন্দোলনের নেতারা বেদেদের মধ্যে এই মতবাদ প্রচার করেছে যে তারা নূহ নবীর বংশধর। তাঁর বিবরণ মতে বেদেরা সাতটি গোত্রে বিভক্ত– বাবাজিয়া, বাজিগর, মাল, মীর শিকার, সামপেরিয়া, শানদার ও রাসিয়া। তাঁর বিবরণ থেকে আরও জানা যায়– বেদেদের নিকট থেকে 'চান্দিনা' ও 'দামাদারি' নামক কর আদায় করা হত। তখন পূর্ব বাংলায় ১৮টি থেকে ৩২টি ভবঘুরে গোষ্ঠী ছিল এবং ১৭৭৭-৭৮ সালে তাদের কাছ থেকে ২৭৬১ টাকা কর আদায় করা হয়েছে।[২১]

বেদেদের একদল 'মানতা' নামে অভিহিত হতে চায়।[২২] জাহানারা হক চৌধুরীর মতে অভিবাসী বেদুইন সম্প্রদায় বোম্বে নগরে আশ্রয় গ্রহণ করে ভিখ মেগে জীবন যাপন করে। সেই থেকে তাদের নাম মানতা অর্থাৎ ভিক্ষা যাদের জীবিকা।[২৩] বেদেদের অন্য একটি দল মনতং গোষ্ঠীর লোক বলেই নিজেদেরকে মনতং বলে পরিচয় দিতে আগ্রহী।[২৪] বেদের আদি বাসস্থান তাদের ভাষা বিশ্লেষণ করে কেউ কেউ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কোনো কোনো মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী বেদে তাদের ভাষার মধ্যে প্রচুর আরবি শব্দের সন্ধান পেয়েছেন।[২৫] বিশেজ্ঞদের মতে তাদের ভাষার নাম 'ঠেট' বা 'ঠের' এবং এ ভাষার সঙ্গে আরকানিদের ভাষার যথেষ্ট মিল আছে। এ ভাষার অধিকাংশ শব্দই বাংলা ভাষার পূর্বরূপ 'প্রাকৃত ভাষা' থেকে এসেছে। আবার গুপ্তচর বৃত্তির সঙ্গে বেদের সংশ্লিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, পেশাগত কারণেই তারা নিজেদের মত করে একটি কৃত্রিম ভাষা– মাঙতা ভাষার সৃষ্টি করেছে এবং সমগ্র ভারতের বেদে সমাজ উক্ত কৃত্রিম ভাষাতেই পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে।[২৬]

৩. বেদেদের যৌনতা প্রসঙ্গ

এই উপ-শিরোনামে বেদের যৌনাচার ও নৈতিকতা, বেদের সংস্কার ও যৌনতা, যৌন অবমাননা ও বেদের প্রতিরোধ-প্রতিশোধ, বেদের ভ্রষ্টাচার ও বিচার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

৩.১ বেদের যৌনাচার ও নৈতিকতা : ইব্রাহীম খলীল তাঁর 'বেদেনী জোলায়খা' উপন্যাসে বেদের যৌনজীবন সম্পর্কে বলেন—বেদেরা নৈতিকতার ধার খুব একটা ধারে না। তারা অনেকটা শৃঙ্খল মুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত।[২৭] 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে বাজিকরদের নৈতিকতার প্রসঙ্গটি লক্ষণীয়:

ছাউনিতে লোভী পুরুষ হামলে পড়লে ছুরি ঝলসে উঠতে পারে। আবার কোনো ব্যভিচারিণী নিজেই তার প্রেমাস্পদকে ছাউনিতে নিয়ে আসতে পারে। পুরুষেরা এসব দেখেও না দেখার ভান করতে পারে। দলের অন্য কেউ কিংবা বাপ মা-ও না দেখে থাকতে পারে কিন্তু ভাইরা প্রায়শ গণ্ডগোল করে। বিষয়টি বিচিত্র বটে।[২৮]

অন্যদিকে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে চুরি-চামারিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া বেদেসমাজ দারোগা প্রমুখের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যান্য ভেটের সঙ্গে নারী ভেট দিয়ে নিজেদের রক্ষা করে।[২৯] 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে যৌবন অতিক্রান্ত যাযাবরী সালমা মালদহের বৃদ্ধ জমিদার বদিউল ইসলামের সান্নিধ্যে প্রায় রক্ষিতা হয়ে থেকে যায় এবং এর বিনিময়ে তার দলের প্রত্যেক পরিবার ৫ বিঘা করে জমি বন্দবোস্ত পায়।[৩০]

'বেদেনী জোয়ালখা' উপন্যাসে জানা যায় কৈশোর উত্তীর্ণ হতে না হতেই বেদে সমাজের ছেলে মেয়ের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে—

বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই বেদে ছেলে-মেয়ের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়: বেদে মহলের প্রেম-সংবেদন ব্যাপারটা অন্য সমাজের মতো নয়। ...মন নিয়েই এদের লেন-দেন। মন নিয়েই এদের কায়কারবার। এদেরও সে মনের সাধনা শুরু হয়, কৈশোরের সূচনা থেকে, সে সাধনায় ওরা সিদ্ধিলাভ করে, প্রথম যৌবনে। তারপর পিতামাতার আশ্রয় ছেড়ে গৃহের বন্ধন ছেড়ে এরা জীবন-তরী ভাসিয়ে দেয় অনির্দিষ্টের পানে—যুগে যুগে।[৩১]

'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে' উপন্যাসে 'জাত শিকারীর বাচ্চা' কিশোরী গেদীকে তার বাবা মোচন বেদে 'ঠাণ্ডা' মেয়ে বলেই জানে। কিন্তু গেদীর একটু বেশি দূরদর্শী মা জানে মেয়ের নরম থাবার মধ্যে ধারালো নখ আছে এবং ইতোমধ্যে সে বেশকটি ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। উক্ত উপন্যাসে ঝুমনি কিশোর বাচ্চুর বয়সী হলেও সাপ খেলাতে 'ওস্তাদ' হয়ে উঠেছে—'বড় বড় গোমা, গোখরো আর কেউটে নিয়ে সে সচ্ছন্দে খেলা করে।' এমন ওস্তাদের কাছে বাচ্চু সাপ ধরা শিখতে চাইলে ঝুমনি কেবল হাসে—'ভালমন্দ' কোনো কথাই বলে না। অনেক পীড়াপীড়ির পর অবশেষে ঝুমনি বাচ্চুর কাছে গুরু দক্ষিণা হিসেবে তার সংসর্গ দাবি করে। প্রায় কিশোর বাচ্চু ঝুমনির প্রস্তাব অনুধাবনে ব্যর্থ হলে পারদর্শী ঝুমনি শেষ পর্যন্ত 'দুধের ছেলে'কে যেমন করে বোঝাতে হয় তেমন করেই বাচ্চুর মতো 'হাবা ছেলেকে' তার প্রস্তাব বোঝাতে পারে। নদী তীরবর্তী ঘাসবনে মন্ত্রমুগ্ধ বাচ্চু ঝুমনির মন্ত্রে সাড়া দিতে গিয়ে গেদীসহ সমবয়সী বেদে ছেলেমেয়ের হাসির খোরাকে পরিণত হয়। ঘটনার আকস্মিকতায়—সমবয়সীদের বিশেষ করে গেদীকে দেখে বাচ্চু ধরা পড়া চোরের মত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেও ঝুমনি এতটুকুও অপ্রস্তুত না হয়ে জিভ ভেংচিয়ে সমবয়সীদের তাড়াতে চেষ্টা করে। আর ঝুমনির আচরণে সমবয়সী ছেলেমেয়েরা গলা খুলে হো হো করে হাসতে থাকে। উক্ত ঘটনার পর বেদে বহরের পরিবেশ ও কর্মকাণ্ড লক্ষণীয়:

কথাটা যে রটে গেছে, সে কথা বুঝতে বাচ্চুর দেরী হোল না। সে দেখল সবাই তার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছে। যেন মস্তবড় একটা মজার ব্যাপার । কিন্তু ওই পর্যন্তই, তার চেয়ে বেশী কিছু না। বাচ্চুর দস্তরমত ভয় করছিল। কিন্তু এর জন্য তাকে কারু কাছে কোন জবাবদিহি করতে হোল না। তবে মোচনের নৌকায় ফিরে এসে দেখল যে সেখানকার আবহাওয়াটা যেন একটু বদলে গেছে। গেদীর মা এমনিতে বেশ হাসিখুশী। কিন্তু আজ তার মুখখানা বড় গম্ভীর, মেঘলা আকাশের মতই থমথম করছে। আর সেই দিন রাত্তিরেই মোচন তাকে একটু গম্ভীর মুখেই হুঁশিয়ারী দিয়ে দিল, 'ঐ ঝুমনি মেয়েটা বড় খারাপ। ওর সংগে বেশী মেলামেশা কোরো না'। বাচ্চু এর উত্তরে ভালমন্দ কোন কথা বলতে সাহস করল না।[৩২]

'পদ্মদীঘির বেদেনী'তে প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ময়না নয়নকে নিয়ে তার চাচা রাজা সাহেবের বহরে গেলে রাতে ময়নাকে নয়নের তাঁবুতে রাত কাটাবার জন্য বেদেনীরা অনুরোধ করে। ব্যাপারটা যেন এমন যে, যেহেতু ময়না নয়নকে সঙ্গে করে এনেছে, তাই তার সঙ্গে রাত কাটানোর ক্ষেত্রে ময়নার দাবি সর্বাগ্রে। ময়না অস্বীকৃত হলে রাজা সাহেবের ঔরসজাত বাঁদির মেয়ে শুখ নয়নের সঙ্গে রাত কাটায়। ঘটনার আকস্মিকতায় রাতে নয়ন লজ্জা পেলেও পরদিন বেদেনীদের হাস্য কৌতুকে তার লজ্জিতভাব ও পাপবোধ উবে যায়। অন্যদিকে শুখের অবয়বে যৌনসম্ভোগজনিত উচ্ছ্বাস দেখে যৌনসুখ বঞ্চিত বিধবা ময়নার মনে হিংসা জন্মে এবং প্রথম সুযোগেই নয়নের সঙ্গে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। রাতে নয়নের সঙ্গে নির্দিষ্ট তাঁবুতে গিয়ে সেখানে শুখকে বসে থাকতে দেখে ময়না দপ করে জ্বলে ওঠে এবং গালি গালাজ দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়। এবং এর ফলে একই সঙ্গে ময়নার হিংস্রতা মন্থর হয়ে আসে ও তার সম্ভোগ ইচ্ছেও চলে যায়।[৩৩]

আলোচিত ঝুমনি-বাচ্চু এবং ময়না-নয়ন-শুখ প্রসঙ্গ থেকে এ কথা বলা যায় যে, বিবাহ-বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক বেদে সমাজে খুব একটা নিন্দনীয় নয়। বিষয়টি তারা ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের ওপর ছেড়ে দেয়। এতে বেদে সমাজের কেউ কিছু মনে করে না। আর তাই বলা হয়েছে— 'বেদের মেয়ে মায়াবিনী, বেদের মেয়ে ছলনাময়ী, বেদের মেয়ে সর্বনাশী, বেদের মেয়ে পোড়ারমুখী! পোড়ামুখ নিয়ে ওরা হাসে, নির্লজ্জা, পাপিনী।'[৩৪]

শৃঙ্খল মুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত বেদে সমাজের বেদেনী চিরকাল রহস্যময়ী, ছলনাময়ী ও কামকলা পটীয়সী। সাধারণ ভাবেই বেদেনীর কথায় 'একটা মন মাতান ঢং আছে, চলনে গমক আছে, রঙ আছে চটুল চোখে।'[৩৫] বেদেনীর রূপের মোহে ও কথার কুহকে পুরুষ পূর্বাপর বিবেচনা না করে অগ্নি অভিসারী পতঙ্গের মতই ছুটে আসে। অভিজ্ঞজন বিষয়টি ভালোভাবে জানে এবং সঙ্গীদের সাবধান করে দেয়।[৩৬] নিষিদ্ধ ফল প্রত্যাশী পুরুষ প্রায়ই বেদেনীর স্বনির্মিত ভীতির বেড়াজাল ভাঙ্গতে চেষ্টা করে। বেদেনীও স্বভাবজাত চপলতায় পুরুষের সঙ্গে মশকরা করতে ছাড়ে না। 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। হাটের বেসাতি শেষে নৌকায় ফেরার পথে এক 'মাঝবয়সী' লোক বেদেনী চাঁপাকে অনুসরণ করে। লোকটিকে দেখেই অভিজ্ঞ চাঁপা তার মতলব বুঝতে পারে। উক্ত পরিস্থিতিতে সে অনায়াসে চলে আসতে পারত কিন্তু হঠাৎ তার মাথায় 'দুষ্টবুদ্ধি' জেগে ওঠে—সে লোকটিকে কাছাকাছি আসার সুযোগ দেয় এবং এক পর্যায়ে লোকটি দুদণ্ড বসে একটু জিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিতেই চাঁপা হেসে বলে 'জিরাইতে গেলে ঘর লাগে মিয়া, পথের পাশে কি আর হয়।' সাহস পেয়ে লোকটি তাকে ঘরে নেওয়ার প্রস্তাব করে এবং চাঁপা তার দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে কাজি ডাকতে বললে লোকটির চৈতন্য হয়। তবুও সে আশা ছাড়ে না এবং পিছনে চলতে চলতেই হঠাৎ দ্রুতপদে কাছে এসে চাঁপার একখানা হাত ধরার চেষ্টা করে। চাঁপা সাপের ভয় দেখিয়ে লোকটিকে বিদায় করে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে এবং লোকটিকে নাজেহাল করতে পেরে একধরনের মানসিক তৃপ্তি পায়।[৩৭] 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাস হতে জানা যায় বেদেনী কেবল মানসিক তৃপ্তি লাভেই তৃপ্ত থাকে না। সে-ও সুযোগ পেলে মত্ত পুরুষের সংসর্গ উপভোগ করে। তাই— বেদের কন্যে অবিশ্বাসিনী, বেদের কন্যে মিথ্যাবাদিনী, বেদের কন্যে পোড়াকপালী পোড়ারমুখী, তার রঙ কালো; কিন্তু তারও উপরে সে কালামুখী। বেদের কন্যে কুহকিনী। বেদের কন্যের আচার মন্দ, সে বিচার ভ্রষ্টা।[৩৮]

৩.২ বেদের সংস্কার ও যৌনতা: বেদেসমাজের যে যৌন আচার তাদের সমাজে চিরকাল মান্যতা পেয়ে এসেছে– তার মূলে রয়েছে– বেদেদের বিশ্বাসের দুটি অনুষঙ্গ। নাগিনীকন্যা শবলা তরুণ সুদর্শন গৃহস্বামীকে প্রায় চুপি চুপি বলেছিল— ...তুমি জান না সোনার লখিন্দর, তুমি বেদের কন্যেরে জান না। বেদের কন্যের লাজ নাই, শরম নাই, বেদের কন্যের ধরম নাই, বেদের কন্যের ঘরের মায়া নাই; বেদের কন্যা বেদেনী অবিশ্বাসিনী। রীত চরিত তার লাগের কন্যে লাগিনীর মতন। রাত লাগলি, আঁধার নামলি চোখে নেশা লাগে, বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে, লাগিনীর মতন সনসনিয়ে চলে, ফণা তুলে লাচে। সে লাচন যে দেখে সে সংসার ভুলে যায়।[৩৯]

কথা বলতে বলতেই শবলার চোখ দুটো 'ঝকঝক' করে উঠলেও সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলে—'সে লাচন তুমাকে দেখাবার উপায় নাই সোনার লখিন্দর।'[৪০] এই যে 'রীত চরিত তার লাগের কন্যে লাগিনীর মতন'—এখানেই বেদেনীর ভ্রষ্টতার মূল নিহিত। বেদের বিশ্বাস অনুযায়ী 'কালনাগিনীর নাগের জাত নাই। অন্য নাগের জাতের সন্তান প্রসব করে কাল নাগিনী।' কালনাগিনীর নাগের জাত নাই কারণ বাসররাতে কালনাগিনীর দংশনে লখিন্দর মারা গেলে বেহুলা সতীর অভিশাপে কালনাগ সৃষ্টি থেকে বিলুপ্ত হল—আর ফিরল না। অথচ পার্থিব নিয়মে কাল নাগিনীর শরীর থেকে চাঁপার গন্ধ বেরিয়ে নাগকে আকর্ষণ করে। কালনাগিনী নরকুলে 'নাগিনীকন্যা' হয়ে জন্ম নিলেও—'...কালনাগিনীর ভাগ্য নিয়েই জন্মায়। তার স্বামী নাই; তাই যে বেদের ছেলের সঙ্গে তার সাদী হয়, শিশুকালে নাগদংশনে তার প্রাণটা যায়।'[৪১] কাজেই কেবল নাগিনীকন্যাই নয় যে কোনো বেদেনীর মন ও শরীরের চাঁপার গন্ধে পুরুষরূপী নাগ যখন ছুটে আসে তখন পার্থিব নিয়মেই তারা মিলিত হয়। এই মিলন একান্তই সৃষ্টির নিয়মের নিগড়ে বাঁধা—সমালোচনার উর্ধ্বে।

বেদের বিশ্বাসের অন্য অনুষঙ্গটি পুরুষের ব্যভিচারের সঙ্গে যুক্ত। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে শিরবেদে মহাদেবের প্রণয়ী দধীমুখী এবং সমস্ত বেদেপল্লি উক্ত প্রণয়ের কথা জানে। পরবর্তী শিরবেদে গঙ্গারাম আরও এককাঠি সরেস। সে দেনার বোঝা চাপিয়ে বেদের ঘরে ঘরে অবাধে তার ব্যভিচার চালিয়ে যায়।[৪২]

বেদের বিশ্বাস অনুযায়ী তার দেবতা দুটি—শিব আর বিষহরি। বিষহরি শিবের কন্যা। অথচ বেদের কপাল এমন যে শিব কুচনী পাড়ায় ঘুরে 'ধরমভেরষ্ট হয়্যা' আপন কন্যা বিষহরির রূপে মোহিত হয়। বিষহরি অবশ্য রূপমুগ্ধ জন্মদাতাকে প্রত্যাখান করে—'ভোলা ভাঙড় চণ্ডীরে ঘুম পাড়ায়ে এলেন মত্যধামে। বিষহরিরে দেখ্যা কামের পীড়াতে লাজ হারালেন, বললেন–কন্যে, আমার বাসনা পূর্ণ কর। মা-বিষহরি তখন রোষ করে বিষদৃষ্টিতে তাকালেন পিতার পানে, শিব ঢলে পড়লেন।' উক্ত উপন্যাসে শিরবেদে আর বিষহরির কন্যা (নাগিনীকন্যা) বাপ আর বেটি। আবার তার বিশ্বাস অনুযায়ী শিবই আদি শিরবেদে বিশ্বম্ভর।[৪৩]

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে দেখা যায় সাঁতালির বেদেসমাজে শিরবেদের একাধিক অবৈধ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সে নাগিনীকন্যার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। উক্ত আসক্তি অধিকাংশ বেদে বুঝতে পারে না এবং দু চারজন বেদে তা বুঝতে পারলেও দেখেও না দেখার ভান করে। শবলার প্রতি মহাদেব এবং পিঙলার প্রতি গঙ্গারামের আসক্তি উক্ত বক্তব্য সমর্থন করে। আসক্তির প্রাবল্য হেতুই মহাদেব রাতের অন্ধকারে চিনতে পেরেও নগ্ন শবলাকে

গ্রহণ করে। অন্যদিকে গঙ্গারাম বেদের বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিদ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে পিঙলাকে পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সাঁতালির বিষবেদের বিশ্বাস–'শিরবেদের উপরে শিবই চাপিয়ে গিয়েছেন তাঁর সেই ভ্রষ্ট জীবনের কামনার অতৃপ্তি।' বেদেসমাজে প্রথম অনুষঙ্গ অনুযায়ী বেদেনী যেমন নাগিনীকন্যার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বাসের অনুষঙ্গ অনুযায়ী বেদেও তেমন শিরবেদের ভূমিকা পালন করছে। তাই—

...বেদের জাতের পরানের ঘরে আবার দুয়ার! দুয়ার লয় গো—আগড়। কোনমতে ঠেকা দিয়া পরানের দুখ ঢেক্যা রাখা। ঝড় উঠলে সে কি থাকে? উড়ে যায়। ভিতরের গুমোট বাইরে এসে আকাশে বাতাসে ছড়ায়ে যায়।[৪৪]

এই 'ভ্রষ্টা' বেদেনী কখনো কখনো বেদের সংস্কার ধর্মের প্রয়োজনেই ভ্রষ্ট হতে বাধ্য হয়। 'পদ্মদীঘির বেদেনী' উপন্যাসে জানা যায়—স্ত্রীলোক গর্ভে সন্তান ধারণ না করলে নরকেও তার স্থান হয় না। নরক থেকে পরিত্রাণের আশায় বেদেনীর সন্তানকে—বিশেষ করে যার বেদে 'অক্ষম পুরুষ'—তার সন্তানকে 'সাত-ভাতারীর' সন্তান—এ গালি হজম করতে হয়। উক্ত উপন্যাসে ময়নার বাবা 'হারামজাদি খানকীর ছানা' ইত্যাদি বলে ময়নাকে দুচারটা গালমন্দ দিলেও সে নিশ্চিত জানে প্রকৃত খানকি হচ্ছে তার মা—তার মেয়ে নয়। ময়নার বাবা কেবল তার মেয়ে ও স্ত্রীকেই গাল-মন্দ করত না। তার বাবার অনেক দোষের মধ্যে একটা দোষ ছিল—যখন তখন যার তার মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলা। সেই স্পষ্টবাদী বেদে সকালে বলে দিত কে কার নৌকায় রাত কাটিয়েছে।[৪৫] এ থেকে বোঝা যায় প্রায় প্রতি রাতেই মনের মানুষের সঙ্গে বেদে বেদেনীর অভিসার চলতে থাকে।

৩.৩ যৌন অবমাননা ও বেদের প্রতিরোধ-প্রতিশোধ: ক্ষেত্রবিশেষে বিচার ভ্রষ্টা বেদেনীর নৈতিকতাবোধ প্রখর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ক্ষমতাধরের লালসার শিকারে পরিণত হবার আশঙ্কা দেখা দিলে বেদেনীর নীতিবোধ সংহারী হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষায় পটু বেদেনী কৌশলে নিজেকে রক্ষা করে। কৌশল ব্যর্থ হলে শিকারিকে শিকারে পরিণত করতে চেষ্টা করে। সেজন্যই বেদেনী গুরুর আজ্ঞা মেনে অস্ত্র ছাড়া চলাচল করে না।[৪৬] শেষ পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে বেদেনী সতীত্ব রক্ষার্থে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। আত্মরক্ষার মতোই আত্মহননের উপকরণও তার কাছে সর্বদা মজুদ থাকে। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে নাগিনীকন্যা শবলা সব সময় বিষপূর্ণ 'নাগদন্ত' কাছে রাখে।[৪৭]

'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে দেখা যায় বাজিকর নারী কবিরাজি বিদ্যার ফাঁদে ফেলে অনেক সময় তার প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করে। শারীরিক সুখ পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত পিড়াপিড়ি করলে দয়ারামের অমানবিকতায় রুষ্ট (সালমা ইতোমধ্যে দয়ারামের অমানবিবকতার কথা জানতে পেরেছে) সালমা 'শরীরে তাকত' ফিরে পাওয়ার ঔষধ দেবার আগেই দয়ারামকে সাবধান করে– বিষয়টি কাউকে জানানো যাবে না। রাতে খামার বাড়িতে শরীরে তাকত বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু করতে গিয়ে দয়ারাম নতুন কেনা মাদি গাধার পায়ের চাট খেয়ে জলচৌকি থেকে গড়িয়ে গাধার পায়ের কাছে মরে পড়ে থাকে। গাধাটা তার খুবই কাছে একটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে ভয়ে সারারাত চিৎকার করেছে।[৪৮] উক্ত উপন্যাসে দারোগা পুত্র আনন্দের সন্তান গর্ভে ধারণ করে প্রবল অবমাননায় জর্জরিত বাজিকরকন্যা পেমা চরম প্রতিশোধ নিয়েছে। কারণ বাজিকরের মেয়ে প্রেমিকা হতে পছন্দ করে কিন্তু কোনোভাবেই 'বেশ্যা' হতে চায় না।[৪৯]

৩.৪ বেদের ভ্রষ্টাচার ও বিচার: 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাস অনুযায়ী-'বস্তুত, বাজিকর মেয়েদের সতীত্বের তেমন বড়াই নেই। কেউ ভ্রষ্টা হলে, দল কিছু শাস্তি অবশ্যই বিধান করে, কিন্তু সে গেরস্থ সমাজের মতো নয়।'[৫০] 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে দেখা যায় বিচার ভ্রষ্টা বেদেনীর বিচার হয়। সন্ধ্যার মধ্যে– বিশেষ করে শৃগালের প্রথম প্রহর ঘোষণার পূর্বেই বেদেনী ঘরে না ফিরলে তার জন্য রয়েছে শাস্তি। উক্ত সময়ের পর যে বেদেনী গাঁয়ের বা আস্তানার বাইরে থাকে তার ঘরে প্রবেশাধিকার থাকে না—অন্তত সেই রাতে সে ঘরে ফিরতে পারে না। বেদে সংস্কার অনুযায়ী বেদেনী বাইরে রাত কাটিয়ে ঘরে ফিরলে তার জন্য কঠিন শাস্তির সঙ্গে জরিমানার বিধান রয়েছে। অবশ্য বেদেনী যদি প্রমাণ করতে পারে যে, ঐ রাতে তার পক্ষে ঘরে ফেরা সম্ভব ছিল না এবং সে সৎ গৃহস্থ বাড়িতে রাত কাটিয়েছে, তবে তাকে সম্মানের সঙ্গে ঘরে ঠাঁই দেওয়া হয়। বেদে সমাজের পুরুষ সহজেই জরিমানা দিয়ে বা নাম কা মাত্র শাস্তি দিয়ে বেদেনীকে ঘরে তুলে নিতে অনেকটাই বাধ্য থাকে। কেননা নৈতিকতার দিক থেকে—বিশেষ করে পর-নারী সংসর্গের ক্ষেত্রে বেদের পুরুষও বেদেনীর মতই বিচার ভ্রষ্ট।[৫১] 'মধুমতী' উপন্যাসে দেখা যায় খেন্তী বেদেনীর পুরুষ চণ্ডিবেদে ছমা বেদের বউয়ের আঁচল ধরে থাকে এবং সাপ না নাচিয়ে অর্থাৎ কুলবৃত্তিতে মন না দিয়ে তার সঙ্গে নাচে।[৫২]

'বেদেনী জোলায়খা'তে একটি বিচার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। উক্ত বিচার প্রসঙ্গে জানতে পারা যায় বেদের মেয়ের মন ভিন্ন জাতের পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হলে এবং তাকে না ফেরানো গেলে শেষ পর্যন্ত শাস্তি হিসেবে প্রণয়ীযুগলকে 'নিশুতিরাতে ডিঙা সাজিয়ে' 'ভাটির দেশে' পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারণ সমাজের বিধান যে অমান্য করে উক্ত শাস্তিই তার প্রাপ্য। প্রাপ্য শাস্তি মেনেই বেদেনী জোলায়খা তার প্রেমিক অচেতন দুলালকে নিয়ে ভাটিতে 'নিকাশ দরিয়ার' দিকে ভেসে যায়।[৫৩]

৪. দাম্পত্য জীবন

এই উপ-শিরোনামে বেদের ছেলে-মেয়ের বিয়ের বয়স, বিয়ে ও লোকাচার, ভিন্নজাতের পুরুষের বেদেসমাজে অনুপ্রবেশের প্রেক্ষাপট, ভিন্নজাতের সঙ্গে বেদেদের প্রণয় ও বিয়ে ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে।

৪.১ বিয়ের বয়স: বাংলা উপন্যাসে বেদে সমাজের বিয়ে ও প্রণয় সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে অত্যন্ত অল্প বয়সেই ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। সাঁতালির বিষবেদের মিথ অনুযায়ী 'নাগিনীকন্যা' হওয়ার প্রথম লক্ষণ কন্যা পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই বিধবা হবে এবং তার স্বামী নাগদংশনে মারা যাবে। সাঁতালির বেদের ঘরে মেয়ের বিয়ের কাল হয় অন্নপ্রাশনের পরই। ছ-মাস থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যায়। সাঁতালির প্রথম শিরবেদে বিশ্বম্ভরের বারো বছরের ছেলে কালাচাঁদের সঙ্গে তিন বছরের দধিমুখীর বিয়ে হয়। অন্যদিকে নোটনের তিন বছরের কন্যা হীরার সঙ্গে গোকুলের দশ বৎসরের ছেলে নবীনের বিয়ে অনুষ্ঠিত হবার দিনে সাঁতালিতে নাগু ঠাকুর এসে উপস্থিত হয়।[৫৪]

বেদে/বাজিকর জীবনকেন্দ্রিক অন্যান্য বাংলা উপন্যাসে বেদের বাল্যবিয়ে প্রায় অনুপস্থিত। 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে জামির বাজিকর ১৭ বছর বয়সে ১০ বছরের লুবিনিকে বিয়ে করে। মহারানির রাজত্বে ১৬ বছরের বেশি বয়সীদের বিয়ে দেওয়া যাবে না– এই গুজবে একই সঙ্গে বাজিকরের ১৫ জোড়া ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়। যদিও– 'বাজিকরের তাঁবুতে এত কম বয়সে বিয়ের রেওয়াজ ছিল না।'[৫৫] 'বেদেনী জোলায়খা'তে বেদে সমাজের প্রণয় সম্পর্কে বলা হয়েছে—

বেদে মহলের প্রেম সংবেদন ব্যাপারটা অন্য সমাজের মত নয়। ...মন নিয়েই এদের লেনদেন। মন নিয়েই এদের কাজ কারবার। এদের সে মনের সাধনা শুরু হয় কৈশোরের সূচনা থেকে, সে সাধনায় ওরা সিদ্ধিলাভ করে প্রথম যৌবনে।[৫৬]

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' অনুযায়ী বেদের বিধবার বয়স ষোল বৎসর পার হওয়ার পর তার বিয়ে হতে পারে। আবার বেদে সমাজে 'ছাড়-বিচার' অর্থাৎ তালাক প্রথাও বিদ্যমান। উক্ত উপন্যাসেই অন্যত্র জানা যায়, বেদে সমাজে কোনো তালাক প্রথা নেই। তাই বাইরে রাত কাটিয়ে ঘরে ফিরলে বেদে তার বেদেনীকে বড় ধরনের শারীরিক শাস্তি দেয় এবং একই সঙ্গে সমাজকে জরিমানা দিয়ে তাকে ঘরে তুলে নিতে বাধ্য থাকে। কেননা বেদেসমাজে কোন 'ছাড়বিড়' নেই।[৫৭]

৪.২ বিয়ে ও লোকাচার: বাংলা উপন্যাসে বেদেসমাজের বিয়েকেন্দ্রিক কিছু কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারা যায়। সাধারণত চৈত্র মাসের মাঝামাঝি প্রকৃতি নানা রূপে-রসে-রঙে-গন্ধে ভরে উঠলে বেদে পাড়ায় নানা রঙের ঢেউ খেলে যায় এবং সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুবাসমণ্ডিত পরিবেশেই বেদেসমাজের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সকল ঘরেই বিয়ের যোগ্য ছেলে মেয়ে থাকে বলে বিয়ের মৌসুমে প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দের লহরি বয়ে যায়।[৫৮] 'বেদেনী জোলায়খা'তে বৈশাখী পূর্ণিমায় মেসের সর্দারের মেয়ের বিয়ে হয়। আবার মেসের সর্দার অগ্রহায়ণ মাসে তার অন্য মেয়ে জোলায়খার বিয়ের দিন ঠিক করে। কারণ বহর থেকে সে আশ্বিনের শেষে ফিরে আসবে। আর কার্তিক মাস মরা কাটালের মাস বলে অগ্রহায়ণের পুণ্য দিনে সে জোলায়খাকে শ্বশুরের ঘরে পাঠাবে।[৫৯] বিয়ের সময় বেদেপাড়ায় উৎসবের ধুম পড়ে। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে হীরা-নবীনের বিয়ে উপলক্ষে বেদে পাড়ার আনন্দময় পরিবেশ লক্ষণীয়–'গায়ে হলুদ মাখছে বেদে এয়োরা, রঙ খেলছে, উলু পড়ছে; ঢোল কাঁসি বাজাচ্ছে পাশের গাঁয়ের বায়েনরা, মরদেরা মদ তুলছে, মদের গন্ধে যত কাক আর শালিকের দল এসে পাড়া ছেয়ে গাছের ডালে বসেছে।'[৬০] বস্তুত বেদের বিয়ের সঙ্গে মদ ও নাচ গানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। 'পদ্মদীঘির বেদেনী' উপন্যাসে বেদে সর্দার রাজা সাহেবের মেয়ের বিয়ের উৎসবে একদল লোক মদ জ্বাল দিতে চলে যায়। কারণ উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মদ্যপান।[৬১] 'বেদেনী জোলায়খা'তে বিয়ে উপলক্ষে বিয়ের দিন থেকেই শুরু হয় তিনদিন ব্যাপী গান—বাউল-বিচ্ছেদ পালার গান।[৬২]

'পদ্মদীঘির বেদেনী'তে বেদে সর্দার রাজা সাহেবের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে নীরবে। রাজা সাহেব নিজেকে আরব বেদুইনের বংশধর মনে করে। সে বিশ্বাস করে তার বাদশাহী কায়দার চাল চলন নৌকায় বাসরত এ দেশি বেদের মতো নয়। এরূপ রাজা সাহেব মেয়ের বিয়ে পরবর্তী উৎসবটা জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে করতে চায়। রাজা সাহেবের অর্থ আছে এবং সেই অর্থ দিয়ে সে তার মনের অহংকার চরিতার্থ করতে চায়। তার মতে জাঁকালো উৎসবই যদি না হয় তবে আনুষ্ঠানিক বিয়েতে লাভ কী? অবশ্য পরিস্থিতির চাপে রাজা সাহেব কাঙ্ক্ষিত উৎসব করতে পারে না। 'নীরব' বিয়ের পর জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ ঠিক হবার আগেই রাজা সাহেবের বেহাইবাড়ি থেকে বিয়ের পরদিনই বিয়ের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করার তাগিদ দেওয়া হয়। বিয়ে ইত্যাদি কারণে ইতোমধ্যে ছেলের বাবার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে—নষ্ট করার মতো সময় তার আর নেই। ব্যবসার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য যত

শিঘ্র সম্ভব সে বহর খুলে অন্য কোথাও চলে যেতে চায়। উক্ত ঘটনা থেকে অনুমিত হয় যে কখনো কখনো ব্যবসারত অবস্থাতেও বেদের বিয়ে হয়ে থাকে। বাংলার সামাজিকতার ঐতিহ্য অনুসরণ করে বেদের বিয়েতেও প্রতিবেশী তথা বেদে বহরের অন্যান্য পরিবার বর-কনেকে সাধ্যমত উপহার সামগ্রী প্রদান করে। রাজা সাহেবের মেয়ের বিয়েতে বহরের 'উনপঞ্চাশ খানা নৌকা' থেকে রাজা সাহেবের নৌকায় 'ভেটবেগার' আসতে দেখা যায়। সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ না করে কেউ চলে যায় না। কেননা বেদের বিশ্বাস অনুযায়ী বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ না করে কেউ চলে গেলে নববধূর মস্ত অকল্যাণ হয়।[৬৩]

'পদ্মদীঘির বেদেনী'তে কনে বিদায়ের সময় বেহুলা-লখিন্দরের উপাখ্যান অনুসৃত হতে দেখা যায়। কনের বহরের বৌ-ঝিরা স্নান শেষে শূচি হয়ে সেজেগুজে কনে শুখকে নিয়ে 'মনসা মণ্ডপে' যায়। তারপর 'বরনকুলা', 'পঞ্চপ্রদীপ' আর 'রক্তজবা' হাতে নিয়ে বেহুলা লক্ষিন্দরের 'ভাসান' গাইতে গাইতে ওরা কনেকে বিদায় দেয়। অন্যদিকে বরের গ্রাম পদ্মদীঘিতে বসে বরের স্বজনরা মৃত লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তোলে। মেয়ে পক্ষ ভেলা ভাসায় দিনে, আর বরপক্ষ তাকে বাঁচায় রাতে। উক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবন চক্রের—হাসি ও কান্নার দুটো পালা সাঙ্গ হয়। অবশ্য রাজা সাহেবের বাঁদির মেয়ে শুখের বিয়েকে ব্যতিক্রমী বলা যেতে পারে। কারণ সাধারণত কোনো সর্দার বিয়ে দিয়ে দাসী বাঁদির মেয়েকে হাতছাড়া করতে চায় না।[৬৪]

বেদেসমাজের বিয়েকে কেন্দ্র করে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। 'ঢেউয়ের নদী ক্লান্ত *পথ*' নামক একটি নকশা জাতীয় রচনায় ভিন্ন জাতের পুরুষ গৃহস্থ ব্যবসায়ী খালেকের সঙ্গে বেদেকন্যা ফুলমালার বিয়ে হয়েছে। খালেক বেদে কন্যা ফুলমালাসহ বেদেসমাজের অন্যদের সম্মতিতে ফুলমালাকে বিয়ে করতে চায়। ফুলমালার সম্মতি পাওয়ার পর ফুলমালার দাদুকে বশ করতে গিয়ে খালেককে 'গোঁজ' থেকে বেশ কিছু টাকা খরচ করতে হয়। খালেক বেদে গোষ্ঠীর বাইরের লোক বলে বেদে সংস্কার অনুযায়ী মাতব্বরের কাছে 'গুলাইলের বাঁশ' পাঠিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বিয়ে হয়ে যায়। বরপক্ষের লাল খাঁর উক্তিতে বিয়ে পরবর্তী বেদে সমাজের একটি সংস্কার জানতে পারা যায়—'বিয়া পড়ানোর পর পোলা গিয়া গাছে উটব, মাইয়া তারে সাইধা নামাইব, কইব, তুমি নাম, আমিই তোমারে রুজি কইরা খাওয়াইমু, নাম তুমি।' লাল খাঁ বেদেদের উক্ত সংস্কার হতে খালেক-ফুলমালাকে রেহাই দেওয়ার জন্য মাতব্বরকে অনুরোধ করলে 'গেরস্তর মান ইজ্জত আমাগ মান ইজ্জতের তন আলাদা' জানিয়ে মাতব্বরও ভবিষ্যতে তার অবস্থান পরিষ্কার করে—'জামাই যতি কোন সময় মাইয়া লইয়া আহে বেড়াইবার, ভালকতা। না অইলে আমার সমাজের কাকপক্ষিডাও কেউ কোনদিন যাইব না জামাইর বাড়ীতে, কি তার গেরাম।'[৬৫]

৪.৩ ভিন্নজাতের পুরুষের বেদে সমাজে অনুপ্রবেশের প্রেক্ষাপট: অমেরন্দ্র ঘোষের 'পদ্মদীঘির বেদেনী' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র নয়ন স্বজনহীন। কৈশোর উত্তীর্ণ প্রায় তরুণ নয়ন মামার আশ্রয়ে থেকে নিজেই রান্না করে খায়। বেদেনী ময়না তাকে কিছুটা প্রশ্রয় দেওয়ায় মমতাময়ী 'বুইনদিদি' ময়নার প্রতি সে দুর্বল। অবশ্য এ দুর্বলতা একেবারে নির্দোষ ছিল না। ময়নার আকর্ষণীয় শরীরী উপস্থিতি এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। পরবর্তীকালে মামা মারা গেলে অনিকেত নয়ন ভাবে—

এর চেয়ে মন্দ কি ছন্দহারা বেদিয়া জীবন? কিসের জাত, কিসের ধর্ম, কিসের মান অভিমান? ও সাপুড়ে হবে, দেশে দেশে সাপ খেলা দেখিয়ে বেড়াবে ⋯আঁকাবাঁকা গাঁয়ের পথ ধরে কত নদী নালা পাড়ি দিয়ে পাহাড়ী দেশের কোল ঘেঁষে—ও শুধু এগিয়ে যাবে দেশ থেকে দেশান্তরে।[৬৬]

'কাঞ্চনমালা'য় সদ্য তরুণ কাঞ্চনের অবস্থা বেশ শোচনীয়। তার জবানিতে জানতে পারা যায়, তার বাড়ি-ঘর-চাল-চুলো কিছুই নেই। গ্রামে খাটুনির নানা কাজ করেও সে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতে পারে না। উক্ত পরিস্থিতিতে সে বেদের দলে যোগ দেয়। অবশ্য কাঞ্চনকে বেদে দলে ভিড়ানোর ক্ষেত্রে বেদে সর্দার মঙ্গলমাঝির কন্যা–বেদে কন্যা মালার ইচ্ছেটাও অনেক বড় ছিল। তার কাছ থেকে সম্মতি আদায় করেই কাঞ্চন বেদে দলে যোগদানের জন্য মঙ্গলমাঝির কাছে আবেদন করে।[৬৭] সত্যেন সেনের 'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে' উপন্যাসের কিশোর বাচ্চু না খেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে রাতে মোচন বেদের নৌকায় এলে মোচন তাকে যত্ন করে খেতে দেয়।বাড়ি পালানো বাচ্চু যখন পরিস্থিতির চাপে একেবারে দিশেহারা তখন 'একটু বেশী দূরদর্শী' মোচনের বউয়ের পরামর্শে মোচন বাচ্চুকে তাদের সঙ্গে বেদে বহরে থেকে যাবার কথা বলে। মোচন দম্পত্তি বাচ্চুকে গুলতি আর তির ধনু চালাতে সহযোগিতা করবে ও সাপ ধরার মন্ত্র শেখাবে শর্তে বাচ্চু তাদের সঙ্গে চলে যায়।[৬৮]

'গুণীন' উপন্যাসে সৎমায়ের অত্যাচারে জর্জরিত রংপুরের ঝুমরু স্বেচ্ছায় বেদের নৌকার সঙ্গে কামলা হিসেবে কোঁচার মুল্লুকে চলে যায়। কোঁচার মুল্লুকের রানীর হুকুম ছিল কোন পুরুষ ভাটির দেশ বা অন্য কোন দেশ থেকে স্বেচ্ছায় তার দেশে আসতে পারে। পরবর্তী সময়ে ঝুমরু বেদের বসতিতে উপস্থিত হয়ে বেদের কাজের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি জীবনেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে বেদে দম্পতির আদরে মুগ্ধ ঝুমরু উক্ত দম্পতির তিন কন্যাকে এক সঙ্গে বিয়ে করে কোঁচার মুল্লুকেই থেকে যায়।[৬৯]

অবশ্য নয়ন, কাঞ্চন, বাচ্চু ও ঝুমরু ভিন্ন জাতের এ চার পুরুষকে দলে ভেড়ানোর ক্ষেত্রে বেদের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্বার্থচিন্তাও কাজ করেছে। 'পদ্মদীঘির বেদেনী' উপন্যাসে নয়ন-শুখের পরবর্তী প্রজন্ম পদ্মদীঘির ধারে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলে ময়নার অচরিতার্থ বাসনা চরিতার্থ করবে—এ আশায় নয়নের প্রায় অজান্তেই পদ্মদীঘির অধিকারী নিঃসন্তান বিধবা ময়না বেদে কন্যা শুখের সঙ্গে নয়নের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলে।[৭০] 'কাঞ্চনমালা'য় মালার বাবা বেদে সর্দার মঙ্গলমাঝি কাঞ্চনকে দলের জন্য উপযুক্ত ভেবেছে।[৭১] 'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে' উপন্যাসে মোচন বেদের বৌ বাচ্চুকে ভাবী মেয়ে জামাই হিসেবে নিজের নৌকায় জায়গা দিয়েছে।[৭২] 'গুণীন' উপন্যাসে ঝুমরুর সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্ক তিন কন্যার বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বেদে পরিবারের স্বার্থ চিন্তা যে একেবারেই ছিল না তা নয়। কেননা কোঁচার মুল্লুকে পুরুষের অভাব ছিল প্রকট। ফলে মায়েরা এমনকি আপন কন্যাকে তাদের বাপ-চাচা থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে পাছে তারা আপন বাপ-চাচাকেই সঙ্গী করে 'আড্ডা ঘরে' নিয়ে যায়। উক্ত উপন্যাসে সবরি তার আপন বোনের মেয়ে তুরার ভয়ে স্বামী হেকমতকে আগলে রেখেছে।[৭৩]

ভিন্নজাতের পুরুষের বেদের দলে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করেও বলা যায় ভিন্নজাতের পুরুষের বেদে সমাজে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ বেদের মেয়ে সঙ্গে প্রেম বা মন-দেওয়া-নেওয়া। সৃষ্টির আদি থেকেই নর-নারীর প্রেমের সম্পর্ক সকল জাত পাতের উর্ধে। 'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে' উপন্যাসে মোচন বেদের বৌ এর জবানিতে জানা যায় কত গৃহস্থ ঘরের ছেলে বেদে মেয়ের রূপের ও মনের টানে পড়ে বাপ মা ঘর সংসার ছেড়ে বেদের দলে ভিড়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে তার বাবাই ছিল প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার বাবা বেদের মেয়েকে বিয়ে করে বেদের দলে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল যে তার জাত চেনার কোনো 'জো' ছিল না।[৭৪]

প্রেমে পড়ে জাত দিয়ে বেদে সমাজে প্রবেশ করতে চাওয়ার ক্ষেত্রে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় দেশের নাগের বিখ্যাত ওঝা নাগেশ্বর ঠাকুর ওরফে নাগু ঠাকুরকে জীবন্ত করে চিত্রিত করেছেন। এ 'ব্রাহ্মণ' ঠাকুরের চালচিত্র বেশ চিত্তাকর্ষক–

জাত নাই, ধর্ম নাই, কোন কিছুতে অরুচি নাই, সব জাতির ঘরে যায়, সবকিছু খায়, পৃথিবীতে মানে না কিছুকে, ভয়ও করে না কাউকে। এই লম্বা মানুষ, গোরা রঙ, রুখু লম্বা চুল, মোটা নাক, বড় বড় চোখ, হা হা শব্দ তুলে হাসে, সে হাসির শব্দে মানুষ তো মানুষ–গাছ পালা শিউরে ওঠে।[৭৫]

প্রচণ্ড ক্ষমতাধর নাগু ঠাকুর শিরবেদে গঙ্গারামের আচমকা কিল খেয়ে তার হাতে বন্দি হলে লোকে বিশ্বাস করেছে—

নাগু ঠাকুরের বুকে কিল মেরেছে—নাগু ঠাকুর যখন উঠবে, তখন সাঁতালীতে বিপর্যয় ঘটবে। মৌমাছি বোলতা ভিমরুলে ভরে যাবে সাঁতালীর আকাশ। কিংবা জ্বলে উঠবে সাঁতালীর কাশে-ছাওয়া ঘর বাড়ি। কিংবা প্রচণ্ড ঝড়ই আসবে—যা হোক একটা ভীষণ বিপর্যয় ঘটবে।[৭৬]

নাগু ঠাকুর জাত পাত মানে না এবং সত্য কথা বলতে লজ্জা পায় না। কেননা 'সাধনপথে' জাত-পাত থাকতে নেই ও সত্য ভাষণের বিকল্প নেই। এমন ঠাকুর নাগিনীকন্যা পিঙলাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে বলে—জাত যদি বা থেকেও থাকে তবে সেই জাত সে অনায়াসে পিঙলার জন্য দিতে পারে। কেবল জাত নয়—রাজসিংহাসন থাকলেও সে তা পিঙলাকে দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু নাগু ঠাকুর জানে নাগিনী কন্যাকে পাওয়া সহজ নয়। কারণ এ কন্যা বিষহরির আদেশে 'বাকবন্ধ' হয়ে সাঁতালিতে রয়েছে। ঠাকুর পিঙলাকে পাবার জন্য তাই চম্পাইনগর মাটিরাঙার মা বিষহরির দরবারে গিয়ে ধরনা দেওয়ার মনস্থ করে। 'ধরনা' কালে সে বিষহরিকে বলবে হয় বিষহরি পিঙলাকে তার কাছে এনে দেবে—নয় তার (ঠাকুরের) প্রাণ নেবে। কন্যার কোনরূপ দেখে এমন দশা হল ঠাকুরের? না—'কালো মেয়ে, তার দুই হাতে দুই গোখুরা, আঃ।'[৭৭]

নাগু ঠাকুরের জাত দেবার এ প্রবণতা 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র বিখ্যাত পালা "মহুয়া"র মহুয়া নদেরচাঁদ সম্পর্কের ক্ষেত্রে নদেরচাঁদের জাত দেবার আকুতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

৪.৪ ভিন্নজাতের সঙ্গে বেদেদের প্রণয় ও বিয়েঃ বাংলা উপন্যাসে বেদেদের দাম্পত্য জীবন ও প্রণয়ের সঙ্গে অন্য জাতের নারী-পুরুষ ও বেদেসমাজের নারী-পুরুষের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'শ্রীকান্ত', ১ম পর্ব (১৯১৭) উপন্যাসের শাহজী শিক্ষিত ব্রাহ্মণপুত্র। খুনের দায়ে গ্রেফতার এড়াতে মুসলমান হয়ে সাপুড়ে বৃত্তি গ্রহণ করে এবং এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কণ্যা অন্নদা স্বামীর সঙ্গে গৃহ ছেড়ে বেদেনীর জীবন গ্রহণে বাধ্য হয়েছে।[৭৮] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' (১৯১৮) গল্পের স্বজনহীন মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে কন্যা বিলাসীকে ভালোবেসে—বিশেষ করে তার সেবায় মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে সাপুড়ে সমাজে প্রবেশ করেছে।[৭৯] দুটো ক্ষেত্রে ভিন্ন জাতের পুরুষের সাপুড়ে বৃত্তি গ্রহণের প্রেক্ষাপট আলাদা মনে হলেও তাদের মধ্যে একটা ঐক্য দেখা যায়। শাহজী ছদ্মবেশ নিতে অর্থাৎ নিরুপায় হয়ে এবং মৃত্যুঞ্জয় নির্বান্ধব অবস্থায় অর্থাৎ নিরুপায়

হয়েই বান্ধব পেয়ে সাপুড়ে মেয়েকে বিয়ে করে সাপুড়ে হয়েছে। বাংলা উপন্যাসে প্রায় সর্বত্রই উক্ত প্রেক্ষাপটে ভিন্ন জাতের পুরুষ বেদে বহরে যোগ দিয়ে বেদেসমাজে প্রবেশ করেছে বা প্রবেশের চেষ্টা করেছে।

বাংলা উপন্যাসে ভিন্ন জাতের নারী-পুরুষের সঙ্গে বেদেসমাজে নারী-পুরুষের বিয়ে নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। 'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে'তে মোচন বেদের বউ বাড়ি পালানো কিশোর বাচ্চুকে মনে মনে তার একমাত্র কন্যা গেদীর বর হিসেবে পছন্দ করে নিজের নৌকায় তুলে নেয়। মোচন বেদের শ্বশুরও ভিন্ন জাতের পুরুষ হয়ে বেদেনীর বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বেদে সমাজে মিশে গেছে।[৮০] এ জাতীয় বিয়ে বেদে সমাজে খুব বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে বলে মনে হয় না। অবশ্য এর উল্টো চিত্র দেখা যায় 'কাঞ্চনমালা' ও 'বেদেনী জোলায়খা' উপন্যাসে। 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে মালার সঙ্গে কাঞ্চনের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠলে শঙ্কিত মা ময়নাবিবি বাবা মঙ্গলমাঝিকে জানায় এবং প্রথম সুযোগেই কাঞ্চনকে বহর ছাড়া করে।[৮১]

'বেদেনী জোলায়খা' উপন্যাসে ভিন্ন জাতের পুরুষের সঙ্গে বেদেকন্যার বিয়ের প্রসঙ্গটি ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। বেদের মেয়ের মন ভিন্ন জাতের পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হলে এবং কোনোভাবেই তাকে ফেরানো না গেলে শেষ পর্যন্ত গভীর রাতে নৌকা সাজিয়ে প্রণয়ী যুগলকে 'ভাটির দেশে' পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারণ সমাজের বিধান অমান্যকারীর জন্য উক্ত শাস্তি বাধ্যতামূলক। অবশ্য সমাজচ্যুত বেদে ভাটির দেশে গিয়ে নতুন সমাজ তৈরি করে সেখানে বসবাস করতে পারে। 'নিকাশ দরিয়া'র পারের সেই অঞ্চল থেকে জীবনে আর পূর্ব বহরে ফেরা যায় না বা সর্দারের সামনে আসা যায় না। বেদেনী জোলায়খা এ শাস্তির ভয়াবহতায় আর্তনাদ করে উঠলে তার বাবা মেসের সর্দার কঠোর ভাষায় জানিয়ে দেয়—শাস্তির আদেশটি কোনো বাবার দেওয়া নয়—'এ আদেশ গুরুর আদেশ।' উক্ত আদেশ মেনে নিয়েই জোলায়খা তার মনের মানুষ দুলালের অচেতন দেহ নৌকায় তুলে ভাটির দেশ 'নিকাশ দরিয়া'র দিকে ভেসে যায়।[৮২] কেবল তাই নয় মেসের সর্দার মেয়েকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে, বিয়ের আগে সে দুলালকে 'ভাইয়ের মত' দেখবে।[৮৩]

'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে বাজিকর পুরুষের সঙ্গে ভিন জাতের নারীর বিয়ে প্রসঙ্গে জানা যায়–বাজিকর সোজন জেলের মেয়ে পাখিকে পরস্পরের পছন্দে বিয়ে করলেও উভয় সমাজের চাপে এক পর্যায়ে সোজনকে ছেড়ে পাখিকে চলে যেতে হয়।[৮৪] এবং শেষ পর্যন্ত সোজন পাখিধরা নলুয়া বেদের বহরে যোগ দিয়ে নিজের বহর ছেড়ে চলে যায়।[৮৫]

ভিন্নজাতের নারী-পুরুষের সঙ্গে বেদেসমাজের নারী-পুরুষের বিয়ের ফলাফলের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে বলা হয়েছে–'...বিয়ে এমন একটি ব্যাপার যার শিকড় সমাজের গভীরতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণভাবে যা চোখে পড়ে না, এইসব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের সম্ভাবনায় তা উপরে উঠে আসে।'[৮৬] এই সত্যটি জেনেও যাযাবরত্বের দেয়াল ভেঙ্গে স্থায়ী হতে বেদেমেয়ের আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় প্রবল হয়ে পড়ে। 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে বহরের বর্ষীয়সী সালমা ভিন্নজাতের পুরুষের কাছে চলে যাওয়া পেমাকে বলে– 'বাজিকরের জাতটাই তো এমন, যে কোন ছুঁতোয় বাঁধা পড়তে চায়।'[৮৭] অবশ্য এই কথাও সমান সত্য যে– 'দলছাড়া যাযাবর মেয়ে-পুরুষ নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় দেখে। দলত্যাগ করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে না।'[৮৮] তারপরও জাগতিক নিয়মেই স্বপ্নের অগোচর যে চিন্তা অনেক সময় তা বাস্তব রূপ নেয়। সংগত কারণে কখনো কখনো উভয় পক্ষকে সমঝোতার পথে আসতে হয়। এই প্রসঙ্গে 'ঢেউয়ের নদী ক্লান্ত পথ' এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। বাঙালি ব্যবসায়ী খালেকের সঙ্গে বেদেকন্যা ফুলমালার মন দেওয়া-নেওয়া হলে খালেক ফুলমালার দাদুর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। খালেকের নৌকার লোকেরা উক্ত প্রস্তাবে সম্মত ছিল না বিধায় প্রস্তাব দেওয়া তার পক্ষে সহজ ছিল না। নৌকার লোকজন খালেকের 'জাত' দেওয়ার বিরোধী ছিল। তারা খালেককে বিয়ে করে জাত দেওয়ার পরিবর্তে—দুই চারদিন মন দেওয়া নেওয়ার খেলার ছলে মনোবাঞ্ছা পূরণের পরামর্শ দেয়। অন্যদিকে খালেকের বিয়ের প্রস্তাবে বেদে সমাজেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বেদেদের অভিজ্ঞতা উক্ত বিয়ের পক্ষে ছিল না। কারণ ইতোমধ্যে তারা দেখেছে তাদের যে মেয়ে অন্যজাতের পুরুষকে বিয়ে করে বহর ছেড়ে চলে গেছে তাদের পরিণতি ভাল হয়নি। বিরোধীদের কথা মাতব্বর এই বলে নাকচ করে দেয় যে 'গেরস্ত ঘরে আমাগ মাইয়া গেলে আমাগ ইজ্জত বাড়ে।'[৮৯]

৫. বেদেদের প্রণয় সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব

বাংলা উপ্যনাসে প্রতিফলিত বেদে সমাজে প্রণয় সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আধিক্য দেখা যায়। বিশেষ করে ত্রিভুজ প্রেমের ক্ষেত্রে উক্ত সংঘাত অনিবার্য। কেবল বেদে সমাজেই নয় ত্রিভুজ প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে—যে কোনো সমাজেই লক্ষণীয়। তবে যাযাবর ও আরণ্যক জীবনের ক্ষেত্রে এ সংঘাতের স্বরূপ ও পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে থাকে। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে সাঁতালির বিষবেদের মিথ অনুযায়ী 'শিরবেদে আর বিষহরির কন্যে—বাপ আর বেটী।' সেই মিথ অনুযায়ী নাগিনী কন্যা শবলা শিরবেদে মহাদেবের কন্যা। অথচ শবলার উপর বৃদ্ধ মহাদেবের দৃষ্টি

পড়েছিল এবং সে দুর্বলতা চোখে দেখা না গেলেও শবলা তা 'অন্তরে অন্তরে' অনুভব করেছিল। বিষবেদে সমাজের এক জোয়ানবেদে শবলাকে প্রণয় নিবেদন করলে শবলার প্রতি মহাদেবের অতি গোপন প্রণয়াকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে দেখা দেয়। নাগিনীকন্যার বাধ্যবাধকতার জন্য শবলা জোয়ানবেদের প্রণয়ে সাড়া দিতে না পারলেও তার প্রতি মমত্ব অনুভব করে। বিষয়টি টের পেয়ে শবলার প্রণয়ী জোয়ানবেদের প্রতি মহাদেব প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠে। এক রাতে সুযোগ বুঝে সে একটা আকামা বিষধর সাপের সাহায্যে ওরা দুজনকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু শবলা সেখানে ছিল না বলে প্রাণে বেঁচে যায়। পরদিন মহাদেব জোয়ানবেদের মৃত্যুকে নাগিনীকন্যা শবলার প্রতি আসক্তিজনিত ফল বলে প্রচার করে। কারণ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বেদেনী কন্যার দিকে পুরুষকে তাকাতে নেই—বেদের পুরুষের তো 'নাই-ই।'[৯০] শবলা মহাদেবের প্রতিহিংসার বিষয়টি ঠিকই বুঝতে পারে। তাই মহাদেব যখন জোয়ানবেদের পাপজনিত মৃত্যুর কথা বলছিল তখন প্রতিশোধ স্পৃহায় তার অবয়ব পাল্টে যায়। পরে শিবরামকে উক্ত প্রসঙ্গটি বলার সময়ও শারীরিক পরিবর্তনে ও কণ্ঠস্বরের জ্বালায় মহাদেবের প্রতি শবলার তীব্র আক্রোশ অত্যন্ত স্পষ্ট। আরও পরে মহাদেব টাকার বিনিময়ে শিবরামকে সর্পবিদ্যা শেখাতে চেয়ে ফাঁকি দিয়েছে মনে করে অর্থাৎ মহাদেব প্রসঙ্গ উঠলেই শবলার চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে—তাকে দেখলে ফণাধারিণী বিষধর বলে মনে হয়।[৯১] পরবর্তীকালে শবলা মা-বিষহরির কাছে তার প্রণয়ী হত্যার দায়ে মহাদেবকে অভিযুক্ত করে বিচার চায় এবং মা-বিষহরির কাছে বিচার চেয়েই শবলা তার কর্তব্য শেষ করে না। শেষ পর্যন্ত সে তার প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য মহাদেবের অঙ্কশায়ী হয়ে সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করে। অন্ধকারে নৌকায় নগ্ন শবলাকে চিনতে পেরেই মহাদেব তাকে গ্রহণ করেছিল—যা থেকে শবলার প্রতি মহাদেবের গোপন কামনা যে শবলার চোখে যথার্থই ধরা পড়েছিল তা বোঝা যায় এবং এ সিদ্ধান্তেও আসা যায় যে শিরবেদে মহাদেব নয়—প্রেমিক মহাদেব নিজের পথ পরিষ্কার করার জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বী জোয়ানবেদেকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। শবলার জীবনে জোয়ানবেদে আসার পূর্বেই শবলার প্রেমিক মনে করে মহাদেব এক গৃহস্থকে হত্যার চেষ্টা করে—যা থেকে শবলার প্রতি মহাদেবের আকর্ষণের তীব্রতা অনুমেয়। গ্রামে বেসাতিকালে সুদর্শন-তরুণ-ধনী গৃহস্বামী শবলাকে আশাতিরিক্ত উপহার সামগ্রী দিলে মহাদেবের মাথা খারাপ হয়ে যায় এবং রাতে নৌকায় শবলাকে না দেখে 'দুয়ে দুয়ে চার' করে ফেলে। কিন্তু কুকুরের তাড়া ও কামড় খেয়ে কোনো অঘটন ঘটার আগেই তাকে ফিরে আসতে হয়।[৯২]

পরবর্তী নাগিনীকন্যা পিঙলাকে কেন্দ্র করে শিরবেদে গঙ্গারাম ও নাগু ঠাকুরের দ্বন্দ্ব ছিল প্রকাশ্য। যথারীতি গঙ্গারাম নাগিনীকন্যা পিঙলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং সে কেবল মনে মনেই তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল না। সে পিঙলাকে পাবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। নাগু ঠাকুর প্রকাশ্যে পিঙলার প্রতি প্রণয় নিবেদন করলে ধূর্ত গঙ্গারাম নাগিনীকন্যার 'ধরম' বাঁচানোর কথা বলে নাগু ঠাকুরকে হঠাৎ আক্রমণ করে বেঁধে ফেলে। পিঙলা গঙ্গারামের মতলব ভালো করে জানত বলেই বুঝেছিল—সুযোগ পেলে পাপী গঙ্গারাম নাগু ঠাকুরকে জ্যান্ত রাখবে না—খুন করে হাঙরমুখীর খালে ভাসিয়ে দেবে। পিঙলার চেষ্টায় মুক্ত হয়ে নাগু ঠাকুর নাগিনীকন্যার দায়বদ্ধতা থেকে পিঙলার মুক্তির সনদ আনতে চলে গেলে গঙ্গারাম পিঙলাকে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং বিষবেদের বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিদ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে পেতে চেষ্টা করে। এতৎসত্ত্বেও পিঙলা গঙ্গারামের বাহুবন্ধনে ধরা না দিয়ে নাগিনীকন্যার মাহাত্ম্য বজায় রেখে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।[৯৩]

'পদ্মদীঘির বেদেনী'তে বিধবা বেদেনী ময়না ভৈরবকে মন-প্রাণ সঁপে দিলেও ভৈরব নির্বিকার। ভৈরবের নির্বিকারত্ব ময়না মেনে নিলেও তার আখড়ায় শ্যামলীর উপস্থিতি মেনে নিতে পারে না। ময়না বুঝতে পেরেছে শ্যামলী ভৈরবের পায়ে আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুত। ফলে সে শ্যামলীকে তার পথের কাঁটা হিসেবে গণ্য করেছে। উক্ত পরিস্থিতিতে ভৈরবের আখড়া থেকে শ্যামলীর গান ভেসে এলে 'ময়নার কানে আগুন-গলানো টলটলে ধাতু কে যেন ঢেলে দেয়।' এবং ময়নার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয় ভয়ঙ্কর,

> ময়না উঠে দাঁড়ায়। ...আঁচলখানা শক্ত করে জড়িয়ে পরে কোমরে। তার স্বামীর রাখা বহুদিনের সঞ্চিত কতটুকু মদ বোতল ভেঙ্গে ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে ফেলে। বেছে বেছে শাণিত টাংগিখানা টেনে আনে মাচার দুয়ার থেকে। কি এক কুটিল হাসিতে যে তার মুখখানা ভরে ওঠে। টাংগির ধারের মতো একটা নিষ্ঠুর হিংসার দ্যুতি যেন ঝকমক করতে থাকে তার বুকের রক্তে। বাসা খোলা ফেলে সে ছুটে চলে উর্দ্ধশ্বাসে। সাপ-খোপ কাঁটা জঙ্গল তার পায়ের তলায় নিষ্পেসিত হয়ে যেতে থাকে।[৯৪]

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব ভৈরব শ্যামলীকে রক্ষা করতে এলে ময়নার টাঙ্গির আঘাত লক্ষভ্রষ্ট হয়ে ভৈরবের হাতে লাগে এবং ভৈরবের হাতের রক্তে ময়নার সারা শরীর মাখামাখি হয়ে যায়। রক্তাক্ত ভৈরবকে দেখে ময়নার নেশা ছুটে যায়—সে অনুতপ্ত হয়।[৯৫]

উক্ত উপন্যাসে নয়ন-ময়নার সম্পর্ক অনেকটাই ভাই-বোনের মতো। তারপরেও ময়নার চাচাবাড়ি যাওয়ার পথে চর-গোখুরীর মাঠে শেষ রাতের জ্যোৎস্নায় নয়নকে দেখে ময়নার ভেতরে কামভাব জেগে ওঠলেও নয়নের নিষ্পাপ অভিব্যক্তি এ যাত্রা তাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক অটুট রাখতে সহায়তা করে। ময়নার চাচা রাজা সাহেবের বেদেবহরে রাত যাপনের সময় নয়নের তাঁবুতে ময়নাকে যেতে বলা হলেও সে নিজে না গিয়ে রাজা সাহেবের ঔরসজাত বাঁদির মেয়ে শুখকে পাঠিয়ে

দেয়। পরদিন সকালে শুখের দেহ-মনে সম্ভোগ সুখের চিহ্ন দেখে ময়নার অনুতাপের শেষ থাকে না—শুখের প্রতি তার হিংসাত্মক মনোভাব জেগে ওঠে এবং প্রথম সুযোগেই নয়নকে শয্যাসঙ্গী করার জন্য সে নিজেকে গুছিয়ে নেয়। রাতে দোদুল্যমান ময়না নয়নের শোবার তাঁবুতে এলে সেখানে শুখকে বসে থাকতে দেখে। শুখকে দেখেই ময়না নিজেকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং গালিগালাজ করে শুখকে নয়নের তাঁবু থেকে বের করে দেয়। ময়নার গালাগাল শুনে রাজা সাহেব ছুটে এসে নয়ন-ময়না-শুখের বিষয়টি বুঝতে পারে এবং পরিণামে শুখকে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। শুখের যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে ময়নার প্রতিহিংসার অবসান ঘটে এবং তার যৌন কামনাও যেন স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাই সে নয়নকে নিয়ে চুপিচুপি পদ্মদীঘির উদ্দেশ্যে সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়ে।[৯৬] নিঃসন্তান বিধবা ময়না নরক থেকে মুক্তির জন্য ভৈরবের কাছে সন্তান ভিক্ষা চায়। ভৈরব ময়নাকে 'পাগল' আখ্যায়িত করে ফিরিয়ে দিলে অকস্মাৎ ময়নার ধৈর্যের সব বাঁধ ভেঙ্গে যায়–তার কথা ও আচরণ উগ্র হয়ে ওঠে,

> কি হামি পাগলা—আর সব সেয়ান? বুনো বেদেনী বাড়-বাগ্নির মতো জ্বলে ওঠে। তার খোঁপা খুলে গেছে, ফুলের মালা ঘরের পাটাতনে লুটিয়ে পড়েছে। সব সেয়ান—আর হামি অজ্ঞেয়ান—ভাগ তোর বিচার লিয়ে। এখন তার বুকের আঁচলও খুলে পড়ে বিশৃঙ্খল হয়ে। ময়না সরোষে ভৈরবকে একটা লাথি মারে। মিঠা জামির।[৯৭]

'বেদেনী জোলায়খা'তে গ্রামের গায়ক দুলাল ও বেদেকন্যা জোলায়খা পরস্পরের কাছাকাছি আসলেও জোলায়খা বেদেকন্যা বিধায় দুলালের পরিবার জোর করে দুলালের অন্যত্র বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধ পরায়ণ জোলায়খা বাসর রাতেই দুলালের খাবার পানির সঙ্গে সাপের বিষ মিশিয়ে তাকে এমনভাবে অজ্ঞান করে যা মৃত্যুর নামান্তর। দুলালের বিয়ের কথা শুনে জোলায়খা প্রথমে বেদনায় মূক হয়ে যায়। তারপর দুলালের হবু স্ত্রীর সৌভাগ্য কল্পনা করে সে আর স্থির থাকতে পারে না। তার দেহ-মনে আগুন ধরে যায়—যে আগুন মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের অথৈ পানি দিয়ে—এমনকি শ্রাবণের অঝর ধারাতেও নিভবে না। এক বুক প্রতিহিংসার আগুন বুকে নিয়ে জোলায়খা তার পরবর্তী কর্মপন্থা মনে মনে ঠিক করে নেয়—

> বেদের মেয়ে সে আঘাত-খাওয়া জীবন নিয়ে চেখের পানি ঝরাবে না। কোন অভিযোগ জানাবে না, কারুর কাছে। তার প্রতিকার সে নিজের হাতেই করবে। জীবনভর ব্যথার বেসাতি নিয়ে সে দিন কাটাতে পারবে না। প্রতিকার! হ্যাঁ, আমিই তার প্রতিকার করবো। যে প্রাণের অধিকার আমি পেয়েছি, সেই অধিকারের জোরেই সবকিছু তছনছ করে দেব। আগুন জ্বালাবো, হ্যাঁ আগুন।[৯৮]

উক্ত 'আগুন' জ্বালানোর জন্য জোলায়খা গুরুর আদেশ না নিয়েই 'ইন্দ্রপুরী' নাচের জন্য প্রস্তুত হয়। সখী জৈগুন গুরুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে সোজা জানিয়ে দেয়—তার মনের চেয়ে তো তার বাবা অর্থাৎ গুরু বড় নয়। ইন্দ্রপুরী এক অদ্ভুত নাচ। এই নাচে ভুল হলে কালনাগ নৃত্যশিল্পীকে দংশন করে আর নাচে জয়ী হলে কালনাগ নৃত্যশিল্পীর 'গোলাম' হয়ে থাকে। এই নাচে জয়ী হয়ে অকালবোধনে জাগ্রত কালনাগের বিষ কাজে লাগিয়ে জোলায়খা তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে।[৯৯]

'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে ত্রিভুজ প্রেমের দুটি চিত্র ও তৎজনিত সংঘাতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বেদে সর্দার মঙ্গলমাঝির কন্যা মালা ও ভিন্ন জাতের পুরুষ কাঞ্চন পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। অন্যদিকে বেদে কন্যা চাঁপা মদন বেদেকে 'দুনিয়াতে সবার উপরে' ঠাঁই দিলেও মদন মালার জন্য পাগলপ্রায়। বেদে বহরে কাঞ্চনের অন্তর্ভুক্তির প্রথম থেকেই মদন কাঞ্চনের প্রতি বিরূপ। কারণ কাঞ্চনের উপস্থিতি মালাকে পাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা বলে তার মনে হয়েছে। তাই নদীতে নৌকা চালানোর সময় মদন কৌশলে কাঞ্চনের নৌকায় ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে। পরে কাঞ্চনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় মদন। নদী তীরবর্তী জঙ্গলে অজগর সাপ দেখে মদন ও কাঞ্চন উভয়েই তা ধরতে চায়। মদন একটু জেদাজেদির ভান করে এ কাজে কাঞ্চনকে উসকে দেয়। এমনকি সাপটা ধরার ক্ষেত্রে কাঞ্চনকে অধিকতর প্রলুব্ধ করার জন্য সে চুপি চুপি এও জানিয়ে দেয় যে, সাপটা ধরতে পারলে মালার প্রতি কাঞ্চনের অধিকার সে মেনে নেবে। অজগর ধরার বিষয়টাকে মদন কাঞ্চনের ক্ষেত্রে ফাঁস হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল অজগরই কাঞ্চনকে শিকারে পরিণত করবে। মঙ্গলমাঝির তৎপরতায় কাঞ্চন সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে যায়।[১০০]

পরবর্তী পর্যায়ে কাঞ্চন-মালার প্রণয়ে ফাটল ধরাবার জন্য মদন তার প্রতি অনুরক্ত চাঁপাকে ব্যবহার করে। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে পূর্ব পরিকল্পনামত চাঁপা ঝোপের ধারে বংশীবাদনরত কাঞ্চনের কাছে গিয়ে তার পুঁতির মালার সুতা ছিঁড়ে ফেলে (এ মালা কাঞ্চনই চাঁপাকে দিয়েছিল) এবং মালাখানি পুনরায় তার গলায় পরিয়ে দেবার জন্য কাঞ্চনকে অনুরোধ করে। চাঁপা হেলেদুলে কাঞ্চনের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টির মাধ্যমে সময় ক্ষেপণ করে এবং মদনের সঙ্গে সর্দারসহ বহরের অনেককে কাছাকাছি দেখতে পেয়ে সে হঠাৎ কাঞ্চনকে জোর করে ঠেলে ফেলে দিয়ে এমনভাবে চিৎকার করে যেন কাঞ্চন তার সম্মানহানির চেষ্টা করছে। মদন-চাঁপার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এতটাই নিঁখুত ছিল যে, সর্দারসহ বেদে বহরের প্রায় সকলেই কাঞ্চনের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সর্দার তাকে বহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। শেষ অবলম্বন হিসেবে কাঞ্চন মালার দিকে চাইলে মালা মুখ নিচু করে নেয় এবং পরিস্থিতি অনুকূলে রাখার জন্য চাঁপা হঠাৎ মালাকে সাবধান করে—মালা যেন সুযোগ সন্ধানী কাঞ্চনের ফাঁদে পা না দেয়।[১০১]

বিতাড়িত কাঞ্চন বহরের কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে মালাকে প্রকৃত ব্যাপার বোঝাতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে মালার প্রতি মদনের টানের বিপরীতে তার প্রতি মদনের অবহেলার ভাব দেখে চাঁপা নিজের ভুল বুঝতে পারে। সে মালাকে প্রকৃত বিষয়টা খুলে বললে মালা ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বুঝতে পারে এবং এক রাতে কাঞ্চনের হাত ধরে বেদের বহর ছেড়ে চলে যায়। পলায়নরত যুগলের দিকে মদন তার মন্ত্রপূত 'কালনাগিনী' ছেড়ে দিয়ে তাদের হত্যা করার মাধ্যমে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে মালদহের নমনকুড়ি অঞ্চলের ধনী সদগোপ পরিবারের কন্যা সুন্দরী রাধার সঙ্গে বাজিকর জামিরের শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে রাধাকে কেন্দ্র করে রাধার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী শক্তিশালী সদগোপ দেদোনের মরণপণ সংঘাত শুরু হয়। এই সংঘাতে প্রাথমিকভাবে জয়ী জামির দেদোনকে হত্যা না করে ছেড়ে দিলে পরবর্তী পর্যায়ে দেদোন দলবলসহ বাজিকর পাড়া পুড়িয়ে বাজিকর নারীদের নির্বিচারে সম্ভ্রমহানী করে।[১০২]

৬. উপসংহার

বেদে সম্প্রদায় যৌনাচারের ক্ষেত্রে নৈতিকতার ধার তেমন ধারে না বলে মনে হলেও এর কয়েকটি দিক লক্ষণীয়: এক. পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে তারা নৈতিকতা বিসর্জন দিতে অনেকটা বাধ্য থাকে। লোকালয়ে বেদে নারীদের যৌনাবেদনময় উপস্থিতি, কামকলা পটীয়ান কথন ও ভঙ্গিমা ইত্যাদি তাদের কুলবৃত্তির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। সংগত কারণে বিশেষ করে প্রশাসন ও ক্ষমতাধরদের লোলুপতা থেকে দলকে মুক্ত করার বৃহৎ স্বার্থে কখনো কখনো তাদের নারীদের নীতি বর্হিভূত কাজে অংশ নিতে হয়। বেদেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার ব্যবহারিক দিক মূলত পেশাকেন্দ্রিক এবং সেইজন্য তা সামাজিকভাবে বহুলাংশে শিথিল। তাই তাদের ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক বিচারে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোর প্রবণতা অতিমাত্রায় সক্রিয়। এই সক্রিয়তার মূলে রয়েছে তাদের দারিদ্র্য ও বৃহৎ জনগোষ্ঠী হতে তাদের বিচ্ছিন্নতা। বস্তুত নির্বিঘ্ন জীবন-যাপনের জন্যই তারা নৈতিক শৈথিল্য মেনে নিতে বাধ্য হয় বললে অত্যুক্তি হয় না। বেদে নারীর প্রচলিত সংস্কার– বিশেষ করে সন্তানহীন থাকার কথিত পরিণতি তাকে পরপুরুষ গ্রহণে প্রলুব্ধ করে। খাঁচায় পোষা প্রাণী/পাখির জীবন থেকে বেদে নারীদের অনেকেই মুক্ত হতে গিয়ে জাত-পাতের বিধান মানতে পারে না। আবার নর-নারীর সম্পর্কের অমানবিকতায় তাদের প্রতিশোধ পরায়ণতা চরম আকার ধারণ করে। প্রণয় সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় তাদের শিক্ষা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংহারের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাতে স্বাভাবিক মৃত্যুর চিহ্নসমূহ বর্তমান থাকে। ব্যতিক্রমী বাল্যবিয়ের বিপরীতে তাদের মধ্যে স্বয়ংবর প্রথার প্রচলন বেশি। এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বেদে পরিবার খুবই সন্তর্পণে তাদের মেয়েদের সেই সব পুরুষের প্রতি আগ্রহী করে তুলে– যাদেরকে দিয়ে বহরের পুরুষের অভাব দূরীভূত হয়ে শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব। তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় আবহমান বাংলার রীতিনীতি লক্ষণীয় মাত্রায় উপস্থিত– যা ক্রমশ বাংলার বৃহৎত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালি সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

[১] আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (অষ্টম সংস্করণ; কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ নি ১৯৯৮), পৃ. ২৪৯।

[২] আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২৪৯। রেজাউর রহমান, সাপ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৩৩।

[৩] রেজাউর রহমান, সাপ, পৃ. ১৪-১৫।

[৪] ঋগ্বেদ, ১০/১৬/৬, ১/১৯১/৭।

[৫] অথর্ববেদ, ৫/৩/৩, ৬/২/৪-৬, ৬/৬/১-৩।

[৬] মহাভারত, আদি কাণ্ড।

[৭] অর্থশাস্ত্র, ৪/৩/১।

[৮] তদেব, ২/২৪/১০।

[৯] নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৩), পৃ. ২৫১।

[১০] আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২৬৩-৮০।

[১১] বাংলা পিডিয়া, "বেদে" ভুক্তি।

[১২] বাংলা বিশ্বকোষ, "বেদে" ভুক্তি।

[১৩] World Book Encylopedia, s.v. "Gypsy" উদ্ধৃত, নাজমুন নাহার লাইজু, বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায় (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ২৯।

[১৪] Encyclopaedia Britannica, s.v. "Gypsy" উদ্ধৃত, নাজমুন নাহার লাইজু, বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়, পৃ. ২৯।

[১৫] Political Dept. Police Branch, A Proceedings, Govt. of Bengal, Calcutta, March, 1916, p-77. উদ্ধৃত, নাজমুন নাহার লাইজু, বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়, পৃ. ২৭।

[১৬] Jahanara Huq Choudhury, Pearl-Women of Dhaka, p-76. উদ্ধৃত, নাজমুন নাহার লাইজু, বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়, পৃ. ২৮।

[১৭] অর্থশাস্ত্র, ১/১২/১-৫।

[১৮] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, "যাদুকরী", তারাশঙ্কর রচনাবলী, ৮ম খণ্ড (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৪), পৃ. ৪০৬।

[১৯] জেমস টেলর, কোম্পানী আমলে ঢাকা,অনুবাদ-মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী,১৯৭৮), পৃ. ১৫২, ১৮৩-৮৪ ও ১৯০।

[২০] অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়* (প্রথম নান্দনিক প্রকাশ; ঢাকা: নান্দনিক, ২০১২), পৃ. ৮। বেদেদের ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ আলমগীর, "বাংলা উপন্যাসে বেদে সম্প্রদায়ের আত্ম ও ধর্মীয় পরিচয় (১৯৪৯-২০১৪)", *বাংলার জনজাতি ও সংস্কৃতি*, ড. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সম্পা. (রাজশাহীঃ বাংলাদেশ ফোকলোর গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৯), পৃ. ১-১৬।

[২১] জেমস ওয়াইজ, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ, অনুবাদ-ফওজুল করিম (সুবর্ণ সংস্করণ; ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৪), পৃ. ৬৯ ও ২৫২-৫৫।

[২২] নাজমুন নাহার লাইজু, বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়, পৃ. ৩৩

[২৩] Jahanara Huq Choudhury, Pearl-Women of Dkaka, P-76, উদ্ধৃত, নাজমুন নাহার লাইজু, বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়, পৃ.২৮।

[২৪] বাংলা পিডিয়া, "বেদে" ভুক্তি।

[২৫] নাজমুন নাহার লাইজু, বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়, পৃ.২৮।

[২৬] বাংলা পিডিয়া, "বেদে" ভুক্তি।

[২৭] ইব্রাহীম খলীল, *বেদেনী জোলায়খা* (দ্বিতীয় সংস্করণ: ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৬), পৃ. ৪৭।

[২৮] অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়*, পৃ. ৪৯।

[২৯] অমরেন্দ্র ঘোষ, *পদ্মদীঘির বেদেনী* (দ্বিতীয় সংস্করণ: কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৫৫), পৃ. ৮৫।

[৩০] অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়, পৃ. ৯৩-৯৫।*

[৩১] ইব্রাহীম খলীল, *বেদেনী জোলায়খা*, পৃ. ৪৭।

[৩২] সত্যেন সেন, *একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে* (ঢাকা: আনিছ বাদ্রার্স, প্রকাশকাল নেই), পৃ. ১৩৯-৪৪।

[৩৩] অমরেন্দ্র ঘোষ, *পদ্মদীঘির বেদেনী*, পৃ. ৭৮-৮৬।

[৩৪] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাগিনীকন্যার কাহিনী*, তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি.,১৯৭৪), পৃ. ১৩৩।

[৩৫] অমরেন্দ্র ঘোষ, *পদ্মদীঘির বেদেনী*, পৃ. ৭৬।

[৩৬] ...খবরদার মিয়ারা, যা কর, যা কর, বাইদ্যার কিল খাইয়া জাইত দিও না। বাইদ্যার মাইয়ার টান টান সিনা দেইখা টোলার দিকে গেলে আর আস্ত ফিইরা আসতে পারবে না হু। বাইদ্যা বড় বিষম জাত। সরদার আব্দুর রাজ্জাক, *ঢেউয়ের নদী কান্ত পথ* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২), পৃ. ৪৮।

[৩৭] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনমালা* (ঢাকা: ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৯৬১), পৃ. ১০০।

[৩৮] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাগিনীকন্যার কাহিনী*, পৃ. ২০৭।

[৩৯] তদেব, পৃ. ১১১ ও ২০৭।

[৪০] তদেব, পৃ. ১১১।

[৪১] তদেব, পৃ. ৮১ ও ১৩৮।

[৪২] তদেব, পৃ. ১৩৭ ও ২০৭।

[৪৩] তদেব, পৃ. ৯৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৫৩,২০৭ ও ২১২।

[৪৪] তদেব, পৃ. ২১০, ২১৩ ও ২২৩।

[৪৫] অমরেন্দ্র ঘোষ, *পদ্মদীঘির বেদেনী*, পৃ. ১১, ১৩, ৬৮ ও ৭১।

[৪৬] তদেব, পৃ. ১৮২।

[৪৭] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাগিনীকন্যার কাহিনী*, পৃ. ১৩৭।

[৪৮] অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়*, পৃ. ৫৪ ও ৬৫।

[৪৯] তদেব, পৃ. ৪৮ ও ৬১-৬২।

[৫০] তদেব, পৃ. ৪৮।

[৫১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাগিনীকন্যার কাহিনী*, পৃ. ১১১-১১২, ১৫৮ ও ২০৭।

[৫২] রাবেয়া খাতুন, *মধুমতী* (ঢাকা: কথা বিতান, ১৯৬৩), পৃ. ১৫। বৌ পোয়াতী বা সদ্য-প্রসূতি হলে পুরুষের উক্ত নাচন তুঙ্গে ওঠে। সদ্য প্রসূতি বৌ এর কারণে ঘরে বেদের মন টিকে না। বেদেনী বুঝতে পারে সন্তান হওয়ার পর থেকে তার পুরুষ মেয়ে মানুষের শরীরের গন্ধের জন্য বাইরে বাইরে ঘোরে। এসব ক্ষেত্রে যদি যৌবনবতী সদ্য বিধবা রূপসী বেদেনী নিজেই সাত (পা) এগিয়ে আসে তবে বেদে পুরুষের আর কিছুই করার থাকে না। সরদার আব্দুর রাজ্জাক, ঢেউয়ের নদী ক্লান্ত পথ, পৃ. ৪১-৪২।

[৫৩] ইব্রাহীম খলীল, *বেদেনী জোলায়খা*, পৃ. ১৪৬ ও ১৪৯-৫০।

[৫৪] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাগিনীকন্যার কাহিনী*, পৃ. ৯৫-৯৬ ও ১৮৫।

[৫৫] অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়*, পৃ. ১২।

[৫৬] ইব্রাহীম খলীল, *বেদেনী জোলায়খা*, পৃ. ৪৭। সাপধরা-খেলানো ও অন্যান্য ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে বেদের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করা হয় এবং অনেক সময় ভোজবাজী দেখানোর মত করেই দুটি বেদে ছেলে মেয়ের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়ের বাজী খেলা শুরু হয়। সরদার আব্দুর রাজ্জাক, *ঢেউয়ের নদী ক্লান্ত পথ*, পৃ. ৩৮।

[৫৭] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাগিনীকন্যার কাহিনী*, পৃ. ৯৫ ও ১৯৮। কোনো কোনো বহরে স্বামী স্ত্রীকে খড়ম দিয়ে পেটালেই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়–বউ তালাক হয়ে যায়। সরদার আব্দুর রাজ্জাক, *ঢেউয়ের নদী ক্লান্ত পথ*, পৃ. ৪২।

[৫৮] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাগিনীকন্যার কাহিনী*, পৃ. ১৮৫। বছরে একবার বেদেদের সবগুলো বহর এক জায়গায় একত্রিত হয়। সেখানে তারা পারস্পরিক আলোচনা করে, বিয়েশাদী দেয়। জেমস ওয়াইজ, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ, পৃ. ২৫২।

[৫৯] ইব্রাহীম খলীল, *বেদেনী জোলায়খা*, পৃ. ২-৩।বৎসরান্তে খালে নদীনালায় যখন দেখা দেয় নতুন জোয়ারের পানি, তখন মন হত উচাটন বেদে টোলার উৎসব মুখর দিনগুলোর জন্য। নৌকার মুখ ঘুরাত তখন তারা কলমিপুর, আড়িয়ল বিল, হলদি গাঁ বা কনকপুরের টোলার দিকে। সরদার আব্দুর রাজ্জাক, *ঢেউয়ের নদী ক্লান্ত পথ*, পৃ. ৩৮।

[৬০] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাগিনীকন্যার কাহিনী*, পৃ. ১৮৫।

[৬১] অমরেন্দ্র ঘোষ, *পদ্মদীঘির বেদেনী*, পৃ. ৮৩।

[৬২] ইব্রাহীম খলীল, *বেদেনী জোলায়খা*, পৃ. ২। বেদের বিয়ের সময় দুমাস ব্যাপী আনন্দ উৎসব চলে। ভালভাবে উৎসবে মেতে উঠবে বলে বেদে উৎসবের দু মাস নৌকার ক্ষুদ্র আবেষ্টন ছেড়ে ডাঙ্গায় নামে। এ সময় বেদে তার ছোট্ট নৌকার ছৈ-টা ডাঙ্গায় তুলে এবং ছৈ-এর ভেতরেই তিন প্রজন্ম একত্রে বাস করে। ডাঙ্গায় বাস করার সময় বেদে বহরের নাম হয় টোলা বা পাড়া। বেদের টোলা বা পাড়ার বিয়ের শেষের উৎসব এরূপ–'বিকেল থেকেই কটি মেয়ে নেচে নেচে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সন্ধ্যা হতে না হতেই শুরু হল গানের আসর। ঢোল, বাঁশী আর দফ বাজিয়ে নারী পুরুষের সমবেত গানে আসর শেষ হতে রাত এগারোটা।' সরদার আব্দুর রাজ্জাক, *ঢেউয়ের নদী ক্লান্ত পথ*, পৃ. ৩৯।

[৬৩] অমরেন্দ্র ঘোষ, *পদ্মদীঘির বেদেনী*, পৃ. ৮৩ ও ৮৬।

[৬৪] তদেব, পৃ. ১৭১-৭২।

[৬৫] সরদার আব্দুর রাজ্জাক, *ঢেউয়ের নদী ক্লান্ত পথ*, পৃ. ৫৩-৫৬।

[৬৬] অমরেন্দ্র ঘোষ, *পদ্মদীঘির বেদেনী*, পৃ. ১১ ও ১৫৩।

[৬৭] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনমালা*, পৃ. ১৪ ও ৬১-৬২।

[৬৮] সত্যেন সেন, *একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে*, পৃ. ১৪০।

[৬৯] আশরাফ সিদ্দিকী, গুণীন (ঢাকা: সাহিত্যমালা, ২০০০), পৃ. ৪৭।

[৭০] অমরেন্দ্র ঘোষ, *পদ্মদীঘির বেদেনী*, পৃ. ১৬৭-৬৮।

[৭১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনমালা*, পৃ. ৬৪।

[৭২] সত্যেন সেন, *একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে*, পৃ. ১৩৮।

[৭৩] আশরাফ সিদ্দিকী, গুণীন, পৃ. ২০।

[৭৪] সত্যেন সেন, *একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে*, পৃ. ১৩৮। ভিন্নজাতের কোনো পুরুষ বহরে এসে পড়লে পোশাক ও মেকআপের সাহায্যে তার চেহারা পাল্টে দিয়ে বেদেদের মধ্যে প্রচলিত নামে তাকে ডাকা হয় যেন কেউ তাকে সহজে চিনতে না পারে। প্রফুল্ল রায়, *বেদের নৌকোয়* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪), পৃ. ৫৪-৫৬।

[৭৫] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাগিনীকন্যার কাহিনী*, পৃ. ১৪৩।

[৭৬] তদেব, পৃ. ১৯২।

[৭৭] তদেব, পৃ, ১৮৬, ১৮৮ ও ১৯৪।

[৭৮] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রীকান্ত', *শরৎ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (প্রথম গ্রন্থতীর্থ সংস্করণ; কলকাতা: গ্রন্থতীর্থ, ১৯৯৬), পৃ. ৩৬।

[৭৯] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিলাসী', *শরৎ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (প্রথম গ্রন্থতীর্থ সংস্করণ; কলকাতা: গ্রন্থতীর্থ, ১৯৯৬), পৃ. ৬১৭-১৮ ও ৬২১।

[৮০] সত্যেন সেন, *একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে*, পৃ. ১৩৮।

[৮১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনমালা*, পৃ. ১৮৩-৮৪। অনুরূপ ক্ষেত্রে *মৈমনসিংহ গীতিকার* "মহুয়া" পালায় বেদে সমাজ নদের চাঁদকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মহুয়ার আত্মহত্যার পর তা কার্যকর করা হয়। "মহুয়া" *মৈমনসিংহ গীতিকা*, পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পা. (চতুর্থ সংস্করণ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ৩৭।

[৮২] ইব্রাহীম খলীল, *বেদেনী জোলায়খা*, পৃ. ১৪৬-৫০।

[৮৩] তদেব, পৃ. ১৪৮।

[৮৪] অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়*, পৃ. ১৪৭-৫৪।

[৮৫] তদেব, পৃ. ১৬১-৬২।

[৮৬] তদেব, পৃ. ১৪৭।

[৮৭] তদেব, পৃ. ৪৭।

[৮৮] তদেব, পৃ. ৪৯।

[৮৯] সরদার আব্দুর রাজ্জাক, *ঢেউয়ের নদী ক্লান্ত পথ*, পৃ. ৫৩-৫৬।

[৯০] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১২, ১১৬, ১২১-২২, ১৩৯, ১৪৬ ও ২১৩।

[৯১] তদেব, পৃ. ১১৭, ১২২ ও ১২৪।

[৯২] তদেব, পৃ. ১৪২, ১৪৫-৪৬ ও ২২১-২৩।

[৯৩] তদেব, পৃ. ১৮৬, ১৯০-৯৩ ও ২২১-২৩।

[৯৪] অমরেন্দ্র ঘোষ, *পদ্মদীঘির বেদেনী*, পৃ. ১০৫।

[৯৫] তদেব, পৃ. ১০৬।

[৯৬] তদেব, পৃ. ৭২, ৭৯, ৮২ ও ৮৬।

[৯৭] তদেব, পৃ. ১৩ ও ১৯৩।

[৯৮] ইব্রাহীম খলীল, *বেদেনী জোলায়খা*, পৃ. ১৩০, ১৩২-৩৩, ১৪৩-৪৪।

[৯৯] তদেব, পৃ. ১৩৫-৩৬ ও ১৪১।

[১০০] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনমালা*, পৃ. ৭৩, ১৪৫ ও ২২২।

[১০১] তদেব, ১৮০-৮৪।

[১০২] অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়*, পৃ. ১২৮-৩১।